সমাজসেবীর নানাকথা

অচিনকুমার চক্রবর্তী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নানাকথা

আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য বহুদিন থেকে চেষ্টা চলছে, একসময়ে এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অনেকেই সমর্থন করেননি; তাঁরা লোকশিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধাচরণ করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করতেন। কারণ তাঁরা জানতেন—সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি আছে বলেই তাঁদের মত মানুষ সমাজপতি হতে পেরেছেন। তা' যদি না থাকত, তাহলে সমাজের উপর তাঁদের এত আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হত না।

যুগের পর যুগ মানুষ অজ্ঞ থাকতে পারে না। জীবনবোধই প্রতিটি বিষয়ে মানুষকে সজাগ করে তোলে। বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা দেখে এবং শুনে যে শিক্ষালাভ করেন, তার মূল্য অনেক। তাই দেশের শিক্ষাব্রতীগণ বলেন, শিক্ষাই বিশ্বাস ও সাহস সঞ্চারের একমাত্র পন্থা। সম্প্রতি ভারতের শিক্ষামন্ত্রীও সেই কথা স্বীকার করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিক্ষা একটি অব্যাহত ধারা এবং সেই কারণেই ইহাকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হইতে হইবে। সমাজের প্রকৃত স্বার্থ এবং জীবনধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সাহিত্য রচনা না করিলে প্রাপ্তবয়স্কদের কোন শিক্ষাসূচীই সফল হইতে পারে না। তবে মানুষের শিক্ষাই সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা হওয়া চাই। অজ্ঞতা, সংস্কার, গোঁড়ামি, যাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ আনে, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামই ইহার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।"

ইতিপূর্বে ভারতের বহু মনীষী, সমাজ সংস্কারের কথা বলে গেছেন। অনেকে সামাজিক অজ্ঞতা, সংস্কার, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামও করেছেন, যার ফলে দেশের মধ্যে আজ দেখা যাচ্ছে এক নব জাগরণ! আজ আর সমাজপতিদের রক্তচক্ষুকে হয়ত অনেকেই

গ্রাহ্য করেন না। কারণ তাঁরা এখন সকলেই সমাজের কল্যাণ চিন্তা করেন, সমাজ সংস্কারের প্রতিও আজ সকলেই আগ্রহশীল। সুতরাং নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনবোধ কোন ব্যক্তি বিশেষে নয়—সমষ্টির জাগ্রত চেতনার প্রতীক। আত্মসচেতন মানুষ মাত্রেই দশের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁরা বলেন সমাজের কথা জানা থাকলে—সংস্কারের কাজ সহজ হয়। তাই অতীত ও বর্তমানে যা দেখেছি এবং যে সমস্ত ঘটনার কথা শুনেছি—তারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থখানি লিখলাম। আশা করি সমাজ-কল্যাণকামী ব্যক্তিদের কাজে গ্রন্থখানি সাহায্য করতে পারবে এবং সকল স্তরের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে "সমাজসেবীর নানা কথা" গ্রন্থের সরস গল্পগুলি সমাদর লাভ করবে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি সাধারণ মানুষের সামাজিক চেতনা জাগ্রত করতে পারে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। যাঁরা আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রাবণী পূর্ণিমা, ১৩৬৮
কলানবগ্রাম
শিক্ষা-নিকেতন

লেখক

উৎসর্গ

শ্রীমান্ অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী
শ্রীমান্ পরিমল চক্রবর্তী
শ্রীমান্ অনুপ কুমার চক্রবর্তী

স্নেহাস্পদেষু

এক

সমাজপতি মশাইয়ের প্রায়শ্চিত্ত ঃ

সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় বসে গল্প বলছিলেন পিসিমা, তাঁর গল্প বলার ভঙ্গীতে সকলেই আকৃষ্ট, তাই নিত্য নতুন গল্প বলতে গিয়ে তাঁকে অনেক সময় সত্য ঘটনার কথা বলতে হয়। সেদিন তিনি বললেন, এটা নিছক গল্প নয়, আমাদের সমাজেরই এক সত্য কাহিনী। সেকালে সবাই বলত কি শোন—

"বারশত বামুন,
তেরশত আড়া।
তার নাম হচ্ছে,
কাশ্যপ্ পাড়া॥"

ছড়াটা শুনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, তের শত আড়া কি পিসিমা ?

একটু হেসে পিসিমা বললেন, তেরশত আড়া মানে তেরশ সাঁকো। অর্থাৎ এই গ্রামে বারশত বামুনের বাস, আর এক সময়ে এখানে তেরশত সাঁকো ছিল। গ্রামের সকলেই কাশ্যপ্ গোত্র। তখন এ' গাঁয়ে বামুন ছাড়া অন্য জাতির লোক বিশেষ ছিল না। পরে

বিভিন্ন জাতির লোক অন্য গ্রাম থেকে এনে বসান হয়েছিল।

পিসিমা গল্পের জের টেনে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, গ্রামের মধ্যে সকলে বামুন। পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতি। জন্ম, মৃত্যু উপলক্ষে প্রায় সকলকেই অশৌচ পালন করতে হয়। অশৌচান্তে হাঁড়ি ফেলার রীতি থাকায় প্রতিদিন সকলে কান খাড়া করে রাখত, কারণ কোন্ জ্ঞাতির সঙ্গে কদিন অশৌচ তার একটা হিসাব আছে। যেমন—পক্ষিনী, একরাত্র, তে রাত্র, দশ রাত্র। দশ রাত্রি অশৌচ যাদের সঙ্গে তারাই সব চাইতে ঘনিষ্ঠ, বাকি সব দূর সম্পর্কের। গাঁয়ে বারশত বামুন নিয়ে এক বিরাট সমাজ ছিল, এর মধ্যে একদল ছিলেন সমাজপতি।

সমাজপতিরা হলেন সমাজের মাথা, তাঁদের কাজ ছিল সমাজের তত্ত্বাবধান করা, বিধি ব্যবস্থা দেওয়া, আর সামাজিক আইন অনুযায়ী শাসনপদ্ধতি পরিচালনা করা। ঠিক এই রকম আর একদল লোক ছিল, তাদের বলা হ'ত মধ্যস্থ। এঁরা সমাজপতিদের নির্দেশ মত সামাজিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিচারসভায়

মধ্যস্থতা করতেন, তাঁদের মতামত অনুযায়ী বিচারের কাজ চলত। আইন আদালত বলতে তখন আর কিছু ছিল না। সমাজপতিরাই আইন রচনা করতেন, তাঁরাই দোষীদের শাস্তি দিতেন। তবে তখনকার শাস্তি দেওয়ার নীতি ছিল অন্য রকম। বিচারের বিষয় বলতে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না পিসিমা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে উঠলেন, হ্যাঁ—কি যেন বলছিলাম ?

কমলা বলল—সমাজপতিদের কথা।

পিসিমা গল্পের খেই পেয়ে বলতে লাগলেন ঐ সমাজপতি বাড়ীর একজন আদি-পুরুষ সেকালে আমাদের উপর খবরদারী করতেন, সেই থেকে ওদের পদবী হয়েছে সমাজপতি। এ' তল্লাটে তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র সর্বেসর্বা। তাঁর কাজ ছিল সকালে উঠে সন্ধ্যা আহ্নিক করা, কপালে তিলক ফোঁটা কাটা, তারপর বাড়ীতে উপস্থিত লোকদের কথা শুনে বিধি-বিধান দেওয়া আর গাঁয়ের পূজা পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করা। অবসর সময়ে নিজের গুণ কীর্তন করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান, পরনিন্দা পরচর্চার আসরে মুখ-

রোচক সংবাদ নিয়ে জটলা করা, আর বিচার-সভা ডেকে মানুষকে বিপদে ফেলা। বংশানুক্রমে ওদের ঐ একই রকম চলে আসছে। মধ্যস্থদেরও ইতিহাস সেই রকম। তবে বরাবরই ওরা একটু চালাক, দু'কূল বজায় রেখে চলতে ওরা জানে। কাজেই সবার সাথেই ছিল তাদের হৃদ্যতা।

কথায় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি; মধ্যস্থরা চালাকি করতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তেন। বললাম, চালাক হলে বিপদে পড়বে কেন পিসিমা! পিসিমা এবার হাসতে হাসতে বললেন, ঐ যে প্রবাদ আছে—অতি চালাকের গলায় দড়ি।

কমলা পিসিমার হেঁয়ালী বুঝত, সে বলল, আসল গল্পটা বলেই ফেলনা দিদিমা, অত ঢং কর কেন? পিসিমা অন্ধ ছিলেন, কণ্ঠস্বর শুনে মানুষ চেনার শক্তি ছিল তাঁর। নাতনীর গলার আওয়াজ শুনে ঠাট্টা করে বললেন, বিয়ের গল্প শুনতে বুঝি খুব ভাল লাগে তোর!

পিসিমার কথায় বুঝলাম, কমলা আর একবার গল্পটা শুনেছে। তাই আমরাও গল্পটা শোনার জন্য ছটফট করছিলাম।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবার আসল গল্পটা পিসিমা আরম্ভ করলেন। সেকেলে মানুষরা বলতেন—

"কনের বাপের ট্যাঁকে কড়ি
বরের বাপের গলায় দড়ি।"

তখনকার দিনে মেয়ের বাপ পণ নিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিতেন, কাজেই যাঁর মেয়ে বেশি থাকত তাঁর দেমাক দেখে কে! মেয়ে সুন্দরী হলে ত কথাই নেই। বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, তাঁর মেয়ে ছিল সুন্দরী। তাই বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের মেয়ে তিলোত্তমার রূপ দেখে মধ্যস্থ মশাই বললেন, মা যেন আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মেয়ের রূপের প্রশংসা শুনে তিনি ভাবলেন এবার বোধ হয় কাজ হাসিল হবে! মধ্যস্থ মশাইকে হাত করতে পারলে তাঁর নাগাল পায় কে?

আসলে বাঁড়ুজ্জে মশাই ছিলেন খুব কুটিল, তেজারতি কারবার করে তিনি অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন। এখন তাঁর ইচ্ছা সমাজপতি মশাইকে ঘায়েল করে তাঁর আসনটি দখল করেন।

মধ্যস্থ মশাই ব্যাপারটা জানতেন, কারণ

সমাজপতি মশায়ের অত্যাচারে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার উপর রয়েছে তাঁর গোঁড়ামি। বাঁড়ুজ্জে মশাই ছিলেন আবার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। তিনি বলতেন, অজ্ঞ লোকদের গোঁড়ামিতে দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে। কথাটা সমাজপতি মশাই শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, বাঁড়ুজ্জে মশায়ের মুণ্ডপাত করতে থাকেন। দু'পাড়ার দুই জন। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। সমাজপতি মশাই যদি পাঁচ কথা বলেন, তাহলে বাঁড়ুজ্জে মশাই দশ কথা শোনান। এই নিয়ে চলল দু'পাড়ার মধ্যে বিবাদ, শেষ পর্যন্ত দলাদলি। এপাড়ার লোক ওপাড়ার লোকদের সঙ্গে এক আসনে বসে না। এক সঙ্গে খায় না।

এই দলাদলির সুযোগে মধ্যস্থ মশাই নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটা একদিন বাঁড়ুজ্জে মশাইকে বলে ফেল্লেন। তাঁর শ্যালক গোবিন্দ, গঞ্জে ব্যবসা করে। বাপের দেড়আনা জমিদারীতেও আয় মন্দ হয় না। বড় ভাই গ্রামের কবিরাজ। ছোট ভাই সুরেন শীলের পাঠশালার পাঠ শেষ করে, শিরোমণি মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ পড়ে। সুতরাং বর-ঘর দুই-ই

ভাল। গোবিন্দের পিতা-মাতা বর্তমান। সংসারে পরিজন আছে, কাজেই এরকম কুটুম্ পাওয়া ভাগ্যের দরকার। তাছাড়া পাত্র মধ্যস্থ মশাইয়ের শ্যালক, এটাও একটা গৌরবের বিষয়।

তিলোত্তমা সুন্দরী, রূপ ও গুণ দুই-ই আছে। বছর তের-এর মেয়ে, সংসারের সকল কাজেই পটু। ঢেঁকিতে ধান ভানা থেকে শুরু করে ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা সেলাই, মুড়ির চাল তৈরি, মুড়ি ভাজা, চিড়ে তৈরি, খই বাছা যাবতীয় কাজ সে জানে। এমন গুণবতী মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের ট্যাঁক ভারী করার মতলব নেই একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

সমাজপতি মশাই ত প্রকাশ্যেই বললেন, ও ব্যাটা মেয়ে বেচে এবার বাড়িতে দালান তুলবে। মধ্যস্থ চায় ফাঁকতালে কাজ উদ্ধার করে নিতে। আর যাই হোক, শ্যালক পয়সা-ওলা শ্বশুর পেলে তার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তাছাড়া সময় অসময়ে দরকার হলে বিনা সুদে টাকা ধার চাওয়ার একটা সুযোগ পাবেন তিনি। কারণ জামাইয়ের ভগ্নীপতি, কন্যাপক্ষের কাছে বিশেষ প্রিয়জন।

মধ্যস্থ মশাইকে হাত করার জন্যই বাঁড়ুজ্জে মশাই মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে কথাবার্তা ঠিক করে ফেললেন, গোবিন্দদাস ভাল ছেলে শুনে বাঁড়ুজ্জে-গিন্নীও কোন ওজর আপত্তি তুললেন না। দু'পক্ষ থেকেই পাকা দেখার তোড়জোড় চলতে লাগল।

বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের একমাত্র সন্তান তিলোত্তমা, কাজেই তিনি মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবেন। ঘরে বন্ধকী সোনা আছে, কাজেই তাঁকে সোনা কেনার কথা ভাবতে হবে না। স্যাকরা ডেকে গয়না তৈরি করার ফর্দটা দিয়ে বললেন, অনন্ত জোড়ার গড়ন যেন ভাল হয়। বিছে হারটা হাল ফ্যাসানের করবে। ছেলের আংটি, বাজুর গড়ন কেমন হবে তা' মধ্যস্থ মশাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে পরে বলব। ভরি ত্রিশেক সোনার মধ্যে জিনিসগুলো বানাতে হবে। নবীন স্যাকরা ত্রিশ ভরি সোনার কথা শুনে আঁতকে উঠে বলল, কর্তা, বলেন কি!

নবীনের আঁতকে ওঠার কারণ আছে, সেকালে এত সোনার গয়না দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। যারা পারত তারা রুপোর গয়না দিত। তাছাড়া টাকা নিয়ে মেয়ের বাপ হাত

গুটিয়ে বসত। পাত্রপক্ষ এসে মেয়ে তুলে নিয়ে যেত, তারপর মেয়ের বাপ গিয়ে কন্যা সম্প্রদান করে আসত।

কুলীন বামুনদের ব্যাপার ছিল অন্যরকম। তাদের মধ্যে পাত্রপক্ষরা পণ নিত, কুলীন সমাজে এক একজন কয়েক গণ্ডা মেয়ে বিয়ে করত। বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যেত না। জামাই সারা বছর ধরে একাধিক শ্বশুর-বাড়ী ঘুরে বেড়াত।

বাঁড়ুজ্জে মশাইয়েরা এক সময়ে কুলীন ছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ এখানে এসে ঘর-জামাই থাকেন। আমাদের সমাজে ঘর-জামাই থাকাটা খুব নিন্দার বিষয়। তাই সমাজপতি মশাই সুযোগ পেলেই বাঁড়ুজ্জে মশাইকে শুনিয়ে বলতেন, বাপের ভিটে ছেড়ে যারা শ্বশুরের ভিটেতে এসে আলো দেয়, তাদের মুখে আবার বড় বড় কথা!

বাঁড়ুজ্জে মশাইও ছেড়ে কথা কন্ না, তিনি বলেন—যে ভগ্নীপতিকে পোলুই চাপা দিয়ে মারে তার আবার বড় গলা কিসের?

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগ্নীপতিকে পোলুই চাপা দিয়ে মারা—সে

আবার কি পিসিমা ! পিসিমা একটা হাই তুলে বল্লেন, সে এক কেলেঙ্কারী। আগেকার দিনে নতুন জামাইকে ঠাট্টা করার নিয়ম ছিল, বিয়ের রাত্রে শ্যালিকারা ভগ্নীপতিকে নানাভাবে জব্দ করত।

—কি রকম ?

তবে শোন। বিয়ের আসরে বরকে দাঁড় করিয়ে মেয়েকে সাত পাক ঘোরায় দেখেছিস্ তো ? তারপর মালা বদল হয়। একে বলে মুখচন্দ্রিকা। এর পর নতুন জামাইকে মেয়েরা ঘরে নিয়ে আসে। প্রথমে তাকে একটা পিঁড়েতে বসতে দেয়, সেই পিঁড়ের তলায় চার কোণে সুপুরী দিয়ে রাখে, জামাই যেই বসতে যাবে অমনি পিড়েটা সরে যায়, বেচারা জামাই তখন ধপাস্ করে আছাড় খায়। মেয়েরা তাই দেখে হাসে। জামাই চালাক হলে পা দিয়ে পিঁড়েটা ঠেলে দিয়ে দেখে নেয়, তারপর তাতে বসে।

কমলা বলল—এ' আবার কোন্ দেশী ঠাট্টা ! নতুন জামাই পড়ে গিয়ে বিয়ের দিন যদি হাত-পা ভাঙ্গে ?

নাতনীর কথা শুনে এবার তিনি বললেন,

ওলো আমার দরদী, তোর বিয়েতে দেখব, কেমন করে ভাতারকে সামলাস্।

পিসিমাকে তাগিদ দিয়ে বললাম, তারপর ?

হ্যাঁ, তারপর কন্যাদান হ'ত। বিয়ের আসরের কাজ শেষ হবার পর বর-কনে ঘরে এনে আরম্ভ হত মেয়েদের ঠাট্টা-তামাসা।

জিজ্ঞেস করলাম, আবার পিঁড়েতে বসতে দিত বুঝি ? না, এবার বসাবে শীতল পাটিতে, তার নীচে থাকবে কই মাছ। জামাই বসতে গেলেই কাঁটার খোঁচা খাবে, নয়ত লাফিয়ে উঠবে। নতুন জামাইয়ের সেই অবস্থা দেখে সকলে হো-হো করে হাসবে। কমলা রাগে গজগজ করে উঠে বলল, যত সব—। নাতনীকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, থামলো, এখনও অনেক বাকি আছে। মেয়েদের মহল থেকে জামাইকে জলখাবার দেওয়ার কথাটা শোন্। মধু জিজ্ঞেস করল—সে আবার কি রকম ?

পিসিমা বললেন, বিয়ের দিন জামাইকে উপবাস করতে হয়। রাত্রে বিয়ের পর জল-খাবার খায়। এই জলখাবারের মধ্যে শ্যালিকারা করে কি, মানকচু নারকেলের মতন করে কুঁড়িয়ে দেয়। জামাই কচু কোঁড়াকে

নারকেল মনে ভেবে যেই মুখে দেয়, অমনি মুখ চুলকোতে আরম্ভ করে! তাছাড়া পিটুলীর সন্দেশ, লুচির মধ্যে ন্যাকড়া, পানের ভেতর লঙ্কা—এ'সব ত আছেই।

সেবার হয়েছিল তাই, সমাজপতি মশাইয়ের বোনের বিয়ে। নতুন জামাইকে মেয়েরা নাজেহাল করল সারাটা রাত। পরের দিন বাসি বিয়ে, তারপর খাওয়া দাওয়া। দুপুর বেলায় শ্যালক-শালিকারা জামাইয়ের সঙ্গে খেতে বসেছে, খেতে বসেও জামাইয়ের রেহাই নেই। সকলেই জামাইয়ের গায়ে ভাত দেয়, কেউ কেউ ভাতের সঙ্গে লঙ্কা মেখে চোখে মুখে দিতে আরম্ভ করল, জামাই অতিষ্ঠ হয়ে ভাত ফেলে দৌড়তে লাগল।

সমাজপতি মশাই জামাইয়ের ছোট শ্যালক, তিনিও জামাইর পিছু নিলেন। বেচারা জামাইর তখন লঙ্কার ঝালে চোখ জ্বালা করছে, সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্যালক সমাজপতি মশাই, একটা মাছ ধরার বড় পোলুই এনে জলের মধ্যে জামাইকে চেপে ধরলেন, সে বেচারা দম বন্ধ হয়ে সেখানেই মারা গেল।

এই নিয়ে সারা গাঁয়ে তখন হৈ-চৈ! সমাজ-পতির অজ্ঞতার জন্য বিয়ের পরদিন বোন বিধবা হ'ল। গ্রামের লোক ত' ক্ষেপে লাল, কারণ বিদেশী ছেলে তাদের গ্রামে বিয়ে করতে এসে এইভাবে মারা গেল—একি কম লজ্জার কথা! তাছাড়া গ্রামের একটা বদনাম হয়ে গেল। সকলেই একথা শুনে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল।

এই ঘটনার পর সমাজপতি মশাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বছর কয়েক পরে এসে মধ্যাস্থ মশাইকে হাত করে দিব্বি খোস মেজাজে আছেন। মধ্যস্থ মশাই ওঁকে রক্ষা না করলে গ্রামের লোক সেবার উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিত।

শিরোমণি মশাই ত বলেই দিলেন, এই পাপের জন্য সমাজপতিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা নাহলে ওঁকে সবাই মিলে ত্যাগ করব, ও একঘরে হয়ে থাকবে। গাঁয়ের শশী-ঠাকুর এই নিয়ে ছড়া বাঁধলেন—

"শাখা দিলা, সিন্দূর দিলা
দিলা বোনের বিয়া,
এখন জামাই বিনে প্রাণ কাঁদে তার
কাঁদে সবার হিয়া।"

গল্প শুনতে শুনতে চোখে ঘুম আসছিল, তাই পিসিমা ছড়াটা শেষ করে বললেন, তিলোত্তমার বিয়ের গল্প তোদের কাল বলব।

দুই

তিলোত্তমার বিয়েঃ

সাত গাঁয়ের লোক বলতে লাগল বাঁড়ুজ্জে মশাই একটা কাজের মত কাজ করছেন। মেয়ের বিয়ে ত বাপু অনেককেই দিতে দেখলাম, কিন্তু পণের লোভ ত্যাগ করতে কাউকে দেখিনি।

নবীন স্যাকরা কথাটা শুনে বলল, পণের টাকা তিনি নেবেন কেন! টাকা নিয়ে বিয়ে দিলে ত কন্যাদান করা হয় না, মেয়ে বিক্রি করা হয়। বাঁড়ুজ্জে মশাই কন্যাদান করবেন। শাস্ত্রে আছে কন্যাদানের পুণ্য পূর্ব-পুরুষরাও পায়।

হরনাথ কথাটা সমর্থন করে বলে, ঠাকুরদার বাড়ী ভিক্ষে করতে গেছল সোনার বউ। তার কাছে শুনলাম, বিয়েতে নাকি খরচ করবেন অনেক, জিনিসপত্র যা কিনেছেন তা

দেখবার মতন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও নাকি থাকবে প্রচুর, বিশ মণ দই মিষ্টির বায়না দিয়েছেন। খাসী কেনা হয়েছে পাঁচটা। তিন দল বাজনা আসবে। বাজি পোড়ান হবে অনেক রকম। শুনছি শশীঠাকুরের কবি গানও দেবেন। হরনাথের কথাগুলো চমক জাগায় সবার মনে, তাই সকলেই তিলোত্তমার ভাগ্যের কথা আলোচনা করতে থাকে।

পিসিমা বললেন, সমাজপতি মশাই নাকি বলেছেন, মধ্যস্থ মশাইকে তিনি দেখে নেবেন। সে তাঁর দলের লোক হয়ে বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে যাচ্ছে! গোবিন্দের জন্য ভাল মেয়ে কি আমরা যোগাড় করে দিতে পারতাম না! আমাকে বললে স্বর্গের অপ্সরার মতন মেয়ে এনে দিতাম। সমাজপতি মশাইর অপ্সরাটি কে তা মধ্যস্থ ভাল করেই জানতেন, কারণ সমাজপতি-গিন্নী একবার তাঁকে ধরেছিলেন। কাজেই পাত্রটি হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে কর্তা-গিন্নী, দু'জনেই তর্জন-গর্জন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তিলোত্তমার বিয়ের দিন গ্রাম ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উঠে বসলেন।

বাঁড়ুজ্জে মশাই খবরটা পেয়ে মনে মনে হাসলেন, আর সবাইকে শুনিয়ে বললেন—ব্যাটা আমার ছিল যেন—"চোদ্দ শাকের মধ্যিখানে ওল পরামাণিক।"

কালিদাস, বাঁড়ুজ্জের কথার সারমর্ম বুঝতে পেরে একটু সায় দিয়ে বলল, তা যা বলেছেন কর্তা, বলি তিলক-ফোঁটা কাটলেই সমাজপতি হওয়া যায়! সমাজপতি হতে ক্ষমতা লাগে।

বাঁড়ুজ্জে মশায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কালিদাস আসন টেনে বসল, তারপর নিমন্ত্রণের ফর্দ ধরে বলতে লাগল—কাশ্যপ্ পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বলা হয়ে গেল কর্তা, এখন বাকি রইল কায়স্থ পাড়া।

কালিদাসের কথার উত্তরে তিনি বললেন, ওটা আবার বাকি রইল কেন? কালই শেষ করে ফেল। পরশুর হাট তোমাকেই করতে হবে। জানকীকে খবর দিয়েছি, সে এসে দীঘি থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা করবে। উমেশ চিঠি দিয়েছে, বিয়ের দিন সকালে তার লোকেরা দই-মিষ্টি পোঁছে দেবে।

কালিদাস, বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের অনুগত কর্মচারী, বহুকাল সে এখানে আছে, তাই তার

উপর সব চাইতে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে বেশী। সুযোগ সন্ধানী কালিদাস, একথা সকলেই জানে।

সে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ, জিনিস-পত্র কিনে বেশ দু' পয়সা ট্যাঁকে গোঁজার তাল খুঁজতে লাগল। বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের সেদিকে খেয়াল নেই, তিনি কুল পুরোহিতের দাবী দাওয়ার ফর্দ নিয়ে ব্যস্ত।

তিলোত্তমার বিয়েতে সব চাইতে ব্যস্ত হচ্ছে বাড়ির মেয়েরা, তাঁরা স্ত্রীআচার রক্ষা করার নিয়ম পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন পাড়ার বৃদ্ধাদের সঙ্গে, কেউ কেউ দেশাচার বজায় রাখার কথাও বলছিলেন।

দেখতে দেখতে দিন ঘনিয়ে এলো, মধ্যস্থ মশাই দু'দিকের হাল সামলাবার কথা ভাবতে লাগলেন। কন্যাপক্ষের তোড়জোড় শুনে গোবিন্দের বাবা ভীষণ প্রমাদ গুণলেন, কারণ তাঁর হাতে যা আছে তাতে খরচ সামাল দেওয়া দায়!

গোবিন্দ বাবার চিঠি পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল, অগত্যা ব্যবসার মূলধন ভেঙ্গে বিয়ের জিনিস কেনা আরম্ভ করল। সে মনে মনে

ভাবল বৌভাতের দিন টাকাটা উঠে আসবে, প্রবাদ আছে স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, কাজেই ভাবনা কিসের! কথাটা শুনে পাড়ার শশী কবি, মনে মনে গান রচনা করতে বসলেন। বিয়ের পরদিন তিনি বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের বাড়ি কবি-গান করবেন।

একদা প্রভাত কালে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির আঙ্গিনায় বিয়ের নহবৎ বেজে উঠল, মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে তিলোত্তমার কোমল অঙ্গে তেল হলুদ মাখিয়ে স্নান করাল। কুলপুরোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়, মন্ত্র পাঠ করিয়ে বাঁড়ুজ্জে মশায়ের পূর্বপুরুষগণকে অন্নজল দান করলেন। প্রতিবেশী গৃহবধূরা বিচিত্র সুরে মঙ্গল-গীত করতে লাগলেন—

আজ গৌরীর গায়ে হলুদ
কাল গৌরীর বিয়া—
গৌরীরে না দেখে শম্ভু
নাচে ত্রিশূল নিয়া ;
ও গৌরী আইস ত্বরা রে—
তোমারে সাজাই মোরা
নানান পুষ্প দিয়া
আজ তোমার বিয়া।

এই রকম বিচিত্র গান শুনে তিলোত্তমার হৃদয় আনন্দে মেতে উঠল, সে বেণী রচনার সময় একমনে অনেক কিছুই ভাবতে লাগল। পাড়ার দিদিমা এসে তিলোত্তমাকে ঠাট্টা করে বললেন—

সেদিন নাইলো নাতিন্,
নাচবে ধিন্তা তাধিন্।
যদি ঘোমটার নীচে বসে থাক,
ব্যাটা নিয়ে আসবে সতীন্।

দিদিমার কথায় লজ্জা পেয়ে তিলোত্তমা হলুদমাখা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রইল। দিদিমা এবার নাকীস্বুরে মেয়েদের সঙ্গে গান ধরলেন—

শিবের তরে গৌরী আমার
ছাড়ল অন্নপানি,
উপবাসে উপবাসে—
কৃশ দেহখানি।
কি দিয়া যে তুষ্টে শিবে
গৌরী ভাবিয়া না পায়,
তপস্যা ক'রতে তখন—
গৌরী বনমধ্যে যায়।

তিলোত্তমার কাছে বসেছিলেন তাদের সকলের প্রিয় ঠানদিদি, তিনি গিয়ে চড়া স্নুরে গলা মেলাতে বসলেন—

উমার তপস্যায় তুষ্ট
দেব শিরোমণি,
তাঁরে আলিঙ্গন দিতে কয়
কাম চূড়ামণি।

পান স্নুপুরী হাতে নিয়ে পাড়ার এয়োতিগণ উলুধ্বনি দিতে দিতে, তিলোত্তমাকে নিয়ে স্নানের ঘাটে গেলেন স্ত্রীআচার সারতে। এই সময় আবার তাঁরা গান আরম্ভ করলেন—

জল ভাঙ্গতে যাইলো মোরা
বরণ কুলা লইয়া,
বাদ্য বাজাও বাদ্য বাজাও
কওলো সখী—
আনন্দিত হইয়া।

বিয়ে বাড়িতে মহা ধুমধাম। আত্মীয়-কুটুমে ভর্তি চারদিক, সকলে ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে কাজ সামলাচ্ছে। এমন সময় আকাশে এল মেঘ, বিদ্যুতের ডাক, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি! বাঁড়ুজ্জে মশাই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—এখন উপায়?

একজন বললেন, মেয়ের মা গলায় বেতের মালা পরে থাকলে বৃষ্টি থেমে যাবে। কেউ কেউ ব্যাঙ্ ধরে মাটির তলায় পুঁতে রাখার পরামর্শ দিলেন, তাতে নাকি বৃষ্টি বন্ধ হয়। মেয়েরা বাড়ির মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, এক ছেলের মা যদি কুশের ডগা কাউকে না দেখিয়ে উঠানের ঈশান কোণে পুঁতে রাখে—তাহলে বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে।

নিধু খুড়ো পুরোহিত ঠাকুরকে বললেন, ওহে জলাধিপতিকে ষোড়শোপচারে পূজা কর, তাতে বৃষ্টি থেমে যাবে—আকাশও পরিষ্কার হবে। তা'নাহলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে একাকার হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তিলোত্তমা দেখল অনেক তুক্‌তাক্ করেও কোন কাজ হল না, আকাশে আরও মেঘ জমে গেল, বৃষ্টি আর থামতেই চায় না! সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই তার মন খারাপ হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেরা তাই দেখে সুর করে বলতে আরম্ভ করল—

"এই বৃষ্টি থেমে যা
লেবুর পাতা করম্‌চা।"

ডানপিটে ছেলে ভোলা, সে জানলার ফাঁকে পা গলিয়ে দিয়ে বসেছিল। ছেলেরা বৃষ্টি থামার গান করছে শুনে, সেও গলা ছেড়ে গান ধরল—

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে
ধানের ভেতর পোকা
জামাই ব্যাটা বোকা।"

তিলোত্তমা এসে ভোলার পিঠে ঢিপ্ ঢিপ্ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে বলল, এই পাজি ছেলে, থাম। রাত্রে বৃষ্টি একটু কমলেও আকাশ সে রকম পরিষ্কার হ'ল না, সেই দুর্যোগের মধ্যে বরযাত্রীরা এসে উপস্থিত হলেন। মধ্যস্থ মশাই, শ্যালক গোবিন্দকে নিয়ে এলেন নৌকাতে চড়িয়ে।

এদিকে বাঁড়ুজ্জে বাড়ির উঠোনে এক হাঁটু কাদা দেখে বরযাত্রীরা প্রমাদ গুণলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরা অত বরযাত্রী নিয়ে খুব বিপদে পড়লেন, তাঁদের ঠিকমত আদর যত্ন করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ল। জল কাদার মধ্যে অনেককেই দাঁড়িয়ে বিয়ে দেখতে হল,

তাঁরা ভালভাবে খাওয়া-দাওয়াও করতে পারলেন না। বাঁড়ুজ্জে মশাই এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাতেও বরপক্ষ বলতে লাগলেন, বর্ষার দিনে যখন বিয়ে তখন উঠোনে একটা বড় ছাউনি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এই রকম অবস্থা হবে জানলে বরযাত্রীর মধ্যে অনেকেই নাকি আসতেন না। মধ্যস্থ মশাই বরকর্তার পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়ে বললেন, এই রকম মুষলধারে বৃষ্টি নামবে তা কন্যাপক্ষ জানবেন কি করে! কাজেই তোমরা একটু কষ্ট স্বীকার করে শুভ কাজ যাতে সম্পন্ন হয়ে যায় তার ব্যবস্থা কর। কোনরকম অভদ্র আচরণ করা আমাদের উচিত নয়। তাছাড়া বাঁড়ুজ্জে মশাই এখন আমাদের কুটুম্ হচ্ছেন, সুতরাং তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা তোমাদের প্রধান কর্তব্য। এর পর ছেলে-ছোক্‌রাদের মুখে আর কোন কথা শোনা গেল না, ভালভাবেই তিলোত্তমার সঙ্গে গোবিন্দের বিয়ে হয়ে গেল।

পরদিন সকলকে বাঁড়ুজ্জে মশাই মধ্যাহ্ন ভোজন আর কবিগান শোনার জন্য নিমন্ত্রণ

করলেন। শশীঠাকুর সে অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল, সুতরাং তাঁর গান হবে শুনে সকলেই খুশী হল। শশী কবির টপ্পা শুনতে অনেক দূর দূর থেকে লোক আসে, তাই বাঁড়ুজ্জে মশাই, কালিদাসকে গানের আসর ভাল করে সাজাতে বলে দিলেন।

শশীঠাকুর তাঁর দলবল নিয়ে ভোরবেলা এসে উপস্থিত হতেই সকলে হৈ হৈ করে উঠল। অনেকে নানারকম গানের ফরমাশ দিয়ে গেল, তিনি নতুন নতুন গান গাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকলকে শান্ত করলেন।

একটু বেলা হতেই শ্রোতারা এসে আসরে জমায়েত হতে লাগল। ঢুলি ঢোলে নানারকম বোল বাজিয়ে আসর গরম করে দিতেই শশী-ঠাকুর উঠে বললেন, আমার বয়েস হয়েছে, আগের মতন গলা নেই। গানে যদি দোষ-ত্রুটি হয় তাহলে আপনারা ক্ষমা করবেন।

শশীঠাকুরের গৌরচন্দ্রিকা শেষ হওয়ার পর ঢুলি আবার বাজনা ধরল। শশী কবি তারপর গলা ছাড়লেন—

শোন ভাই, ধিনৃতা ধিনা
ধিনাক্ ধিনা—ঢোলে কথা কয়,

এখানে কি গাহিতে কি গাহিব
মনে লাগে ভয়,
ধিন্‌তা ধিনা—ধিনাক্ ধিনা
ঢোলে কথা কয়।

ভাইরে,

দেখি সব অপকর্ম্মা
হচ্ছেন—শর্ম্মা
মানুষ কেহ নয়!
ধিন্‌তা ধিনা—ধিনাক্ ধিনা
ঢোলে কথা কয়।
তারা, শাস্ত্রকথা জানে না'ক
কেহ, ভাল কথা মানে না'ক
তবু, তারাই বিদ্যাবাগীশ হয়।
ধিন্‌তা ধিনা—ধিনাক্ ধিনা
ঢোলে কথা কয়।

দেশাচার আর লোকাচার
দেখছি কত স্ত্রীআচার,
সকলে মুখ বুজে তাই সয়,—
তাইত লাগে এত ভয়;
ধিন্‌তা ধিনা—ধিনাক্ ধিনা
আমার ঢোলে কথা কয়।

যত বলি, ও সব কিছু না'ক
কেউ, সে কথা শোনে না'ক,
তাইত, তাদের সূর্য যণ্ড
এই, স্বভাব কবি কয় !
ভাইরে, ধিন্‌তা ধিনা
বল সব, ধিনাক্ ধিনা,
—মিথ্যা কিছুই নয়।

শশী কবির প্রথম গান শুনে শ্রোতারা কানাকানি করতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ ভাবল এর পর কি গাইবে তার ঠিক কি ! মেয়েরা বেশভুষা সামলাতে লাগল, কারণ শশী কবি তাদের নিয়েই যদি টপ্পা গান ধরেন, তাহলে রক্ষা নেই। "যাদৃশী ভাবনা যস্য"—

শশী কবি এবার টপ্পা গানের বাজনা বাজাতে বলে আবার আসরে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক দেখে হাসতে হাসতে তিনি গান ধরছেন, এমন সময় মধ্যস্থ মশাই আর গোবিন্দ, একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন দেখে শশী কবি মুচ্‌কি হেসে সুর টানলেন—

দেখ এই বিয়া বাড়ি
মানুষ ভারি,

পোশাকের নাই শেষ
আহা বেশ—বেশ
মেয়েরা মনের মত
সাজছে কত,
লজ্জার নাইকো লেশ
আহা বেশ—বেশ।
যাদের আছে লম্বা দাড়ি
খবরদারি,
এবার তাদের দফা শেষ
আহা বেশ—বেশ।

টপ্পা শেষ হতে না হতেই আসরে হাসির বন্যা ছুটল। মধ্যস্থ মশাই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হুকোতে টান মারলেন, শশী কবি তাই দেখে গান গাইলেন—

কর্তা কন্ যদি
প্রাণ ত্যাগ করি,
তামুক খাওয়া—
ছাড়তে না পারি।

শশীঠাকুর তামাক বিলাসী একথা বাঁড়ুজ্জে মশাই জানতেন, তাই তিনি নিজেই হুকোটা তাঁর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন—সেবন করে

নিন, গলার সুর মিঠে হবে। কবি একগাল হাসি ছড়িয়ে জবাব দিলেন, বেয়াই মশাইয়ের জন্য মিঠে তামাক আমদানি করলেন নাকি? হাস্যরসিক শশী কবি আসরে বসতেই ঢুলি নেচে নেচে ঢোল বাজাতে আরম্ভ করল। আবার শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল—দেখ এবার কি গান ধরেন! কবি, মওকা বুঝে আসরে গান গাইতে আরম্ভ করলেন অদ্ভুত গ্রাম্য সুরে, সেই সঙ্গে করতে লাগলেন নানা-রকম অঙ্গ-ভঙ্গী—

আ মরি নতুন কায়দার বিয়া,
অনুষ্ঠান দেখে শুনে—
নাচি ধিয়া ধিয়া
দেখ ভাই কেমনতর বিয়া।

এতদিন ছিলাম ছাগল
এখন হলেম পাগল,
সমাজে নাম কিনতে গিয়া
দেখরে মন আমার,
নতুন কায়দার বিয়া।

আসর গরম হয়ে উঠল গানখানায়, কয়েকজন অনুরোধ জানাল আর একখানা গান

শোনাতে। এদিকে বেলা শেষ হয়ে যাওয়ায় কন্যাপক্ষ সকলকে মধ্যাহ্ন ভোজনে যাবার জন্য ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। শশী কবি তাই তাঁর শেষ গান শোনাতে উঠে বললেন—

ভাইরে, আজ এই পর্যন্ত
হলেম ক্ষান্ত
ঢোলে দিয়া ঘাই।
এখন, যাবার সময়
গুরুজনদের
প্রণাম দিয়ে যাই।

তার পরেতে এখন মোরা
কি করি ভাই বল,
এখন, সন্ধ্যাকালে বলে কিনা
মধ্যাহ্ন-ভোজনে চল!

বামুনবাড়ির নেমন্তন্ন
ঠেলতে করে ভয়,
সমাজচ্যুত করতে তারা
যে সিদ্ধহস্ত হয়।

ভাইরে, এই পর্যন্ত হলেম ক্ষান্ত
ঢোলে দিয়া ঘাই,
লৌকিকতা রক্ষা করে
যে-যার বাড়ি চল যাই।

পিসিমার গল্প শেষ হবার আগেই কমলা বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে একটা চিম্‌টি কেটে তার দিদিমা বললেন— কি লো, তিলোত্তমার বিয়ের গল্প শুনলি ?

তিলোত্তমার গল্প আমিও একটা জানি, এই বলে কমলা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

আমরা গল্পটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

তিন

বারোয়ারীতলা ঃ

বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের বাড়ি শশীঠাকুরের কবি-গান শুনে গাঁয়ের লোকের টনক নড়ল ; হঠাৎ একদিন তারা মাতব্বরদের ডেকে বলল— সমাজের রীতি-নীতি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতির সকলেই এতে সায় দিল।

ব্রাহ্মণরা বললেন, অন্য জাতের লোকদের সঙ্গে এক আসনে বসে আমরা আলোচনা করতে পারব না। আমাদের নিয়ম আছে নীচু জাতের লোকের কোন কাজ কর্মে নিয়ে যেতে হলে আগে সম্মানী দিতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে আবার কি পিসিমা ? আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ হ'ল বর্ণশ্রেষ্ঠ। কাজেই তাঁদের কোন কিছুতে ডাকতে হলে প্রথমে এসে ব্রাহ্মণদের কাছে আমন্ত্রণ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। তিনি সম্মানী পেয়ে তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেবেন, তারপর তাঁকে কাজের কথা বলতে হবে। সেই কাজে যাওয়া যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় তবেই তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। যেমন অন্য জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই তাদের ভোজন-দক্ষিণা দিতে হয়! কোন সভাতে যদি ব্রাহ্মণরা যান তাঁদের সভাস্থ দেবার নিয়ম আছে। এই সভাস্থ পাওয়াকেই আমরা ব্রাহ্মণ বিদায় বলি। কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের নগদ টাকা, পিতলের বালতি, সোনার জিনিস, কাপড় নয় ত চাদর দেন।

ব্রাহ্মণদের এ সব দেয় কেন পিসিমা ?

পিসিমা বললেন, সেকালে ব্রাহ্মণদের আয়ের পথ বিশেষ ছিল না। তাই তাদের জীবন খুব দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটত। তাছাড়া ব্রাহ্মণদের অনেক রকম সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হ'ত, সেইজন্য তাঁরা চাকরি

করতে পারতেন না। তখন দেশে বড় বড় অনেক জমিদার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে পণ্ডিতদের বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। অনেকে আবার ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দান করতেন, তার আয় থেকেই তাঁদের সংসার খরচ চলে যেত।

ক্রমে যখন এই ব্যবস্থা লোপ পেতে লাগল তখন ব্রাহ্মণরা সম্মানী আদায় করতে লাগলেন। এও যখন সমাজে লোপ পাওয়ার উপক্রম হ'ল তখন লাগল গোলমাল। এই গোলমালের জন্য ব্রাহ্মণরাই দায়ী, কারণ সম্মানী পেতেন সেকালে পণ্ডিতরা। পণ্ডিত সাধারণত ব্রাহ্মণরাই হতেন। কাজে কাজেই কালে কালে সকল ব্রাহ্মণগণই সম্মানী দাবী করতে লাগলেন। কথায় কথায় তাঁদের সম্মানী লোক দেবে কেন? এই নিয়ে আরম্ভ হল আন্দোলন। অন্য জাতির লোকেরা ডাকল সভা।

সভায় মাতব্বররা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ তুলে বলতে আরম্ভ করল, আমাদের ব্রাহ্মণরা ঘৃণা করেন, তাঁরা আমাদের জল খেতে চান না। তাঁদের বাড়ি খেয়ে আমাদের বাসন মেজে দিতে হয়! আমরা

তাতে অপমান বোধ করি। এই ব্যবস্থার একটা প্রতিকার করা দরকার। নয় আমরা তাঁদের বাড়ি খাওয়া ত্যাগ করব, নতুবা খেয়ে বাসন আর মাজব না। আমরা মানুষ, সুতরাং আমাদের দাবী তাঁদের মানতে হবে। নচেৎ তাঁদের কোন কাজকর্মে আমাদের সহ-যোগিতা করা চলবে না।

পূবপাড়ার মাতব্বর বলল, আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যেই ভেদাভেদ রয়েছে। আমরাও অনেকের জল খাই না। এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে হলে আমাদের সকলকেই গোঁড়ামি ত্যাগ করে এক হতে হবে, নতুবা আমাদের কোন কথাতেই ব্রাহ্মণেরা কর্ণপাত করবেন না। আমরা যদি একতাবদ্ধ হই, তাহলে আমাদের শক্তি দেখে সকলেই নম্র হবে, তখন কথাও সকলে শুনবে।

দক্ষিণপাড়ার মাতব্বর হরেন দাস, সে আবার ব্রাহ্মণ-ভক্ত লোক। রোজ সকালে নাকি হরেন, একটা ছোট পাথরের বাটিতে একটু জল নিয়ে ব্রাহ্মণের চরণামৃত করে আনতে যায়। নিজস্ব তার আবার একটা মন্ত্র

আছে। ব্রাহ্মণের পায়ের আঙ্গুল বাটির জলের মধ্যে ডুবিয়ে সে বলে, কর্তা বলেন—

অকাল মৃত্যু হরনম্
সর্ব ব্যাধি বিনাশনম্।

তারপর বাটিতে চুমুক দিয়ে ব্রাহ্মণকে ভক্তিভরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, কর্তা এই প্রাতঃকালে আপনার মুখ দিয়ে বলেন—আমি যেন আপনার চরণামৃত পান করে পুত্র পৌত্রাদি নিয়ে সংসারে সুখে থাকতে পারি। আমার ঘরে কারও যেন অকাল মৃত্যু হয় না। কর্তা আপনি আশীর্বাদ করে যান, আমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই হচ্ছে দক্ষিণপাড়ার হরেন দাস।

পূবপাড়ার মাতব্বরের কথা শুনে সে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, শুধু মুখে বললে হবে না, কাজে দেখান চাই।

পূবপাড়ার মাতব্বর এ'কথার উত্তরে বলল, হাঁ, আমরা এবার কাজেই দেখাব। আপনারা আমাকে কথা দিন যে সকলে সেই কাজে এগিয়ে আসবেন, যদি দরকার হয় সাহায্য করবেন।

পশ্চিমপাড়ার রামকৃষ্ণ, এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার মুখ খুলল—ভাল কাজ করলে সাহায্য করব না কেন ?

উত্তরপাড়ার যদুনাথ প্রবীণ লোক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে তাঁর খ্যাতি আছে। অনেক ভেবে তিনি বললেন—তোমরা এক কাজ কর, আগে নিজেদের মধ্যে কতটা একতা আছে তা পরীক্ষা করার জন্য এবার সার্বজনীন পূজার আয়োজন করে ফেল, তাহলেই সবার মন বোঝা যাবে। তারপর অন্য কথা ভাবলেই হবে, প্রবীণ যদু-নাথের কথাটা সকলেই মেনে নিল। শুধু হরেন দাস বলল, পূজা করতে হলে পুরোহিত চাই, গ্রামের কেউ পূজা করতে রাজি হবে কি ?

সে ব্যবস্থা আমি করব—জবাব দিলেন যদুনাথ।

চার পাড়ার লোক এক হয়ে সার্বজনীন পূজা করবে ঠিক হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আয়োজন হ'ল মহাষ্টমীর দিন শশীঠাকুরের একপালা কবিগানের। পরদিন সংবাদটা চার-দিকে ছড়িয়ে পড়তেই বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিল।

ব্রাহ্মণরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন—কে ওদের পূজা করে দেখাই যাক।

সব শুনে মধ্যস্থ মশাই হেসে বললেন, ওহে তোমরা আর কতকাল ওদের দমিয়ে রাখবে !

শিরোমণি মশাই ভাবলেন, মধ্যস্থ ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। যদুনাথ তাঁর প্রজা যখন, তখন এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই আছে। তবে মধ্যস্থ বোধ হয় কাজটা ভাল করছে না, কারণ তাঁর এখনও বিবাহযোগ্যা দুটি মেয়ে আছে।

শিরোমণি মশাইয়ের কথা শুনে বেদান্ততীর্থ বললেন ওহে মধ্যস্থ, তোমাকে যে সবাই ভয় দেখাচ্ছে ! দেখ বাপু শেষটায় আমার যেন দোষ দিও না।

মধ্যস্থ হাসতে হাসতে বললেন, 'যাবৎ বিবি বড় হবে তাবৎ মিঞা কবর যাবে।"

বেদান্ততীর্থ মশাই প্রগতিপন্থী লোক। তিনি কথাটা সমর্থন করলেন, কারণ তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী একটু অন্য রকম। সামাজিক অজ্ঞতা, সংস্কার প্রভৃতিকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিদেশে থেকে তাঁর ধ্যান ধারণা বদলে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁকে নতুন পথ দেখিয়েছে, তাই তিনি গ্রামে এসে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করছেন। যদুনাথকে উৎসাহ

তিনিই দিয়েছেন। গম্ভীর মহাপণ্ডিত এই মানুষটি একদিন যদুনাথকে বলেছিলেন, শাস্ত্রের কোন জায়গায় লেখা নেই—মানুষকে তোমরা ঘৃণা কর।

যদুনাথের কাছে বেদান্ততীর্থ মশাইর কথাটি বড় ভাল লেগেছিল। তাই সে সময় পেলেই তাঁর কাছে আসে। নিত্য নতুন কথা শোনে, আর নতুন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে! পণ্ডিত মশাই তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেন, দেখ মহৎ কাজে অনেক বাধা। সেই বাধার ভয় করলে কি তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে?

—তা হবে না।

তবে ভয় খাচ্ছ কেন, এগিয়ে যাও, আমি তোমাদের পিছনে আছি।

এমন কথা যদুনাথ আর কোনদিন শোনেনি, তাই উৎসাহে সে মেতে ওঠে।

সার্বজনীন পূজার প্রতিমা তৈরী করছিল নরেন কুমোর, বেদান্ততীর্থ মশাই পূজা করবেন। এ'সব শুনে শশী কবি নতুন গান রচনায় মন দিলেন। দেখতে দেখতে বোধনের দিন এসে

গেল, পূজার উদ্যোক্তারা মণ্ডপ সাজাতে আরম্ভ করলেন। পরদিন মহাধূমধাম করে পূজা আরম্ভ হ'ল, বেদান্ততীর্থ শাস্ত্রমতে সকলকে অঞ্জলি দেওয়ালেন।

মহাষ্টমীর দিন শশীঠাকুর কবি গাইতে এসে বললেন—এতদিনে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হল, তাই তিনি প্রথমেই আসরে ঢুকে গান ধরলেন—

ওমা দশভুজে—
সবাই তোরে পূজে,
আমি মরি খুঁজে—
তোর ঐ দুটি রাঙ্গা চরণ।

তুই মা অগতির গতি
দিয়ে সবায় সুমতি,
ঘোচা দেশের দুর্গতি
এই আকুতি তোর রবে কি স্মরণ।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী
জগৎ উদ্ধারিণী,
ভবের দুঃখ এবার
তুই কর মা হরণ।

ওমা দশ ভুজে
দেখ সবাই তোরে পূজে,
আমি মরি খুঁজে
তোর ঐ দুটি রাঙ্গা চরণ।

কবির মুখে ভক্তিমূলক গান শুনে শ্রোতারা অবাক হয়ে গেল, কারণ শশীঠাকুর সাধারণতঃ এই ধরনের গান করেন না। সকলেই তাঁকে আর একখানা ভক্তিমূলক গান করতে অনুরোধ জানাল, তিনি পরে গেয়ে শোনাবেন বললেন। আসরে অনেক লোক বসেছে দেখে কবির মনে খুব আনন্দ হ'ল, তাই এবার তিনি নতুন গানখানা ধরলেন—

সমাজের কত কথা
মনেতে আছে গাঁথা,
সে কথা বলতে আজি
প্রাণে ব্যথা পাইরে,
আমরা সব ভাই— ভাইরে।

দেখেছি অনেক ভেবে
আমরা মানুষ সবে,

শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ বলে
কোথাও কিছু নাইরে ;
আমরা সব ভাই—ভাইরে।

বেদান্ততীর্থ মশাই গানখানা শুনে বললেন, চমৎকার ! চমৎকার !! শ্রোতারাও কবির গানে আত্মহারা হয়ে বলল—আবার গাও ভাই, আবার গাও ! যদুনাথ দাস সকলকে শান্ত হয়ে বসতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আরও অনেক গান হবে। আগে একখানা টপ্পা হোক। কবির রসাল টপ্পা গানের কথা শুনে আসরের সকলে হৈ-হৈ করে উঠল। গোল-মাল থামাবার জন্য শশীঠাকুর ঢুলিকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা গান আরম্ভ হল—

রাম গেল বনবাসে
সঙ্গে গেল সীতা,
গুহক চণ্ডাল হ'ল
মস্ত বড় মিতা,
আহা—বেশ—বেশ।

জাত বলে তখন কিছু
ভাবে নাই রঘুমণি,
একথা কি জানেনাক
গাঁয়ের শিরোমণি,
আহা—বেশ—বেশ।

জাত জাত বলে যাঁরা এতদিন
মোদের করেছে শক্তিহীন,
মহাষ্টমীর দিন ধরে এনে
তাঁদের উৎসর্গ করে দিন,
আহা—বেশ—বেশ।

শশী কবি লোক ভাল না
যাঁরা পিছনে বসে কয়,
আর জন্মে তাঁরা যেন
অকাল-কুষ্মাণ্ড হয়,
আহা—বেশ—বেশ।

এই পর্যন্ত হলাম ক্ষান্ত
গানে দিয়া ইতি,
ঐ দেখ সমাজপতিরা গান শোনে
পিছনে মাথায় দিয়া ছাতি,
আহা—বেশ—বেশ।

শশী কবির টপ্পা গানে আসর জমে উঠেছে, এমন সময় আরতির বাজনা বেজে উঠল। মাতব্বরগণ এসে বললেন, আরতি শেষ হয়ে গেলে আবার গান হবে। আরতির পর প্রসাদ বিতরণের পালা, সকলেই প্রসাদ নেবার জন্য লাইন দিল। প্রবীণ লোক যদুনাথ দাস সকলকে প্রসাদ দিতে লাগলেন।

শিরোমণি মশাইয়ের নাতি শিবনাথ ছেলে-মানুষ, সে কোথা থেকে ছুটে এসে প্রসাদ নিয়ে গেল। পাড়ার লক্ষ্মীদাস তাই দেখে শিবনাথের কানটি ধরে টানতে লাগল! শিবনাথ কেঁদে উঠতেই লক্ষ্মীদাস বলল, চল তোর দাদুর কাছে, ওদের পূজার প্রসাদ খেয়েছিস্, দেখবি তোকে তিনি কি করেন!

লক্ষ্মীদাসের কাছে শিবনাথের প্রসাদ খাওয়ার কথা শুনে শিরোমণি মশাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, আর বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন, এমন কি বেদান্ততীর্থ মশাইকে কুলাঙ্গার, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি বলে মুণ্ডপাত করতেও ছাড়লেন না।

পরদিন পাঁজি পুঁথি দেখে শিবনাথকে গোবর জলে স্নান করিয়ে পঞ্চগব্য খাইয়ে শান্তি-স্বস্তয়ন করলেন, এবং দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তবে নাতিকে ঘরে তুললেন।

শিরোমণি মশাইয়ের এই গোঁড়ামির কথা শুনে নবমীর দিন আসরে শশীঠাকুর গান ধরলেন নজরুলের প্রখ্যাত গানের অনুকরণে—

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া,
খেলেই তোদের জাত যাবেরে
জাত, ছেলের হাতের নয়কো মোয়া।

ছোট জাতের ছোঁয়া খাবি না
দোষ নাই নিতে তাদের পান গুয়া,
জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।

তোদের সৃষ্টিকর্তা করল মানুষ
তাত তোরা হলি না,
হয়ে এখন সং-এর ফানুস,
মনুষ্যত্বের কিছু রাখলি না।

বিধাতা আর কত কাল—সইবি এ সব,
ধ্বংস কি এদের করবি না !
সৃষ্টি তোর লোপ হয়ে যে
মানুষ-পশুর ভেদাভেদ রইল না ।

কবির গান শুনে যদুনাথ দাস আসরে ছুটে গিয়ে শশীঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে বেদান্ততীর্থ মশাই কবিকে কি বলে অভিনন্দন জানাবেন ভেবে পেলেন না ।

গল্পটা শেষ হতেই আমি বিস্ময় প্রকাশ করে পিসিমাকে বললাম, সেকালে আপনাদের গ্রাম্য সমাজ এই রকম ছিল !

পিসিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, এ আর কি শুনলে বাবা, সমাজে আরও কত অনাচার অত্যাচার ছিল ! উপরে থুথু ছুঁড়লে নিজের মুখেই এসে পড়ে, কাজেই এখন আর সেকথা বলে লাভ নেই। আমাদের সর্বনাশ আমরাই করেছি, তাই বলে তোমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মের না। সব সময়ে যদি অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ কর, তাহলে তোমাদের জীবনে কোনদিন বিপর্যয় ঘটতে পারবে না। অতীতে আমরা যে ভুল করেছি, সে রকম ভুল তোমরা কোর না যেন।

চার

ভুবন কবিরাজের গ্রাম সফর ঃ

শ্রীনাথ কবিরাজের প্রিয় ছাত্র ছিলেন আমাদের ভুবন কবিরাজ; শুনেছি সেকালে শ্রীনাথ চক্রবর্তী ছিলেন দেশের মধ্যে নাম-করা কবিরাজ। তাঁর নাড়ীজ্ঞান এমন ছিল যে, রোগীর নাড়ীতে আঙ্গুল দিলেই তিনি রোগ ধরে ফেলতে পারতেন। তারপর করতেন রোগীর চিকিৎসা। শ্রীনাথ কবিরাজের ওষুধ খেয়ে আরোগ্য লাভ করেনি একথা কেউ বলতে পারে না। তাই সকলে তাঁকে বলত ধন্বন্তরি শ্রীনাথ কবিরাজ। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত তাঁদের বাড়িতে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত, তাঁর কাছে জাতিবিচার ছিল না। সকল জাতির লোককেই তিনি চিকিৎসা করতেন, সবার বাড়িতেই তিনি যেতেন; কাজে কাজেই সকলের কাছে তিনি ছিলেন পরম পূজনীয় ব্যক্তি।

এ হেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র হলেন গাঁয়ের ভুবন কবিরাজ, লোকে বলে যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, অর্থাৎ গুরুদেবের সকল

গুণই ছিল ভুবন কবিরাজের মধ্যে; তিনিও গ্রামের বিখ্যাত চিকিৎসক। বহু লোক তাঁর কাছে আসে চিকিৎসা করাতে; ভাল মানুষ বলে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। ভুবন কবিরাজের কাছেও ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না।

প্রতিদিন কবিরাজ মশাই দু'বেলা গ্রামে বের হতেন, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতেন, সকলেই তাঁকে দেখলে বসতে আসন দিত, তিনিও দু'দণ্ড বসে গল্প করতেন, তামাক খেতেন। রোগী থাকলে দেখে ওষুধ দিতেন। সুতরাং গ্রামের সব রকম খবরাখবর ভুবন কবিরাজ যেমন রাখতেন, সে রকম আর কারও পক্ষে রাখা সম্ভব হ'ত না।

গ্রামের সার্বজনীন পূজার আগে ও পরে অনেকে তাঁর কাছে নানারকম কথা বলেছেন, তিনি কিন্তু কারও কথায় কোন উচ্চ-বাচ্য করতেন না।

সেদিন যখন শিরোমণি মশাই তাঁর সামনে বেদান্ততীর্থের মুণ্ডপাত করতে আরম্ভ করলেন, তখন আর কবিরাজ মশাই চুপ করে থাকতে পারলেন না, তিনি একটা কথা শুধু বললেন,

"ঠাকুরমশাই, মানব অধিকার বলে একটা জিনিস আছে। সেই অধিকারকে যদি কেউ অস্বীকার করতে চায়, তাহলে তাকে মানুষ বলা চলে না।" ভুবন কবিরাজের মুখে এই ধরনের কথা শুনবেন শিরোমণি মশাই তা ভাবতেও পারেন নি; তাই তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—"তুমিও দেখছি ঐ দলে।"

"আমি কোন দলাদলিতে নেই ঠাকুর মশাই, তবে মহৎ কাজে কোন দিন বাধাও দিই না। বেদান্ততীর্থ আমার বাল্যবন্ধু, তাকে আমি ভাল রকম জানি, তার কাজে আমার আস্থাও আছে। সে যখন নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করছে, তখন মঙ্গল ছাড়া আমাদের অমঙ্গল হবে না।"

তিলকে তাল করে বলা এক-একজনের স্বভাব আছে, গাঁয়ের পঞ্চাননের স্বভাবটি ঠিক সেই রকম। সে ভুবন কবিরাজ আর শিরোমণি মশাইয়ের কথাগুলি এমন ভাবে রটিয়ে বেড়াতে লাগল, যার ফলে উভয়ের সমর্থকগণ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা বেদান্ততীর্থ মশাইয়ের কাছে ভাল লাগল না, তাই তিনি ছুটে এলেন কবিরাজ বন্ধুর কাছে। ভুবন

কবিরাজ সব শুনে বললেন—পঞ্চানেনর কাণ্ডই ঐ রকম। ও বরাবরই তিলকে তাল করে বলে ; ওর সামনে কোন কথা বলাই বিপদ।

আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বেদান্ততীর্থ মশাই বললেন, যাকগে ও সব কথা। এখন একটা কাজের কথা বলি, তুমিত ভাই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াও। গ্রামের অবস্থা কি বুঝছ বল দেখি ?

হাওয়াটা যেন একটু অন্য রকম বোধ হচ্ছে, —বললেন কবিরাজ মশাই।

একটু অন্য রকম ত' হবেই, কারণ ওরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। কতদিন আর জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। একদিন-না-একদিন মত পরিবর্তন করতেই হবে। তাছাড়া কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও রূপান্তর ঘটবে। তখন সকলেই নিজেদের অজ্ঞতা বুঝতে পারবে ; এই দেখ না কেন, দক্ষিণ পাড়ার হরেনকে ! সে আগে যেমন ছিল এখন কি সে রকম আছে ?

হরেনের কথা তুলতেই কবিরাজ মশাই বললেন, ওর কথা বাদ দাও। ও মুখে এক, মনে

আর এক ; যা বলবে করার সময় করবে তার উল্টোটা। হরেনের একটা গল্প বলি শোন।

আট আঙুল কাঠি ঃ

সেবার হরেনের ছোটছেলেটার খুব অসুখ হয়েছিল। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে ছেলেটাকে দেখাল। আমি দেখে বললাম—এর ন্যাবা হয়েছে। কিছুদিন ওষুধ খাওয়ালেই ভাল হয়ে যাবে। হরেনের স্ত্রী ছেলের গা-হাত-পা হলদে হয়ে গেছে দেখে বলল—কুদৃষ্টি লেগেছে, সুক্‌পুরে ছেলেটাকে নিয়ে চল। সেখানে রামরতন আছে, সে খুব ভাল ওষুধ জানে।

হরেন হিসেব করে দেখল—সুকপুর যেতে হলে টাকা তিনেক খরচ লাগবে, আবার ওষুধ নিলেও পয়সা দিতে হবে। কাজেই সে তখন ছুটল মাধব ঘোষের কাছে। মাধব নাকি নানারকম তুক্‌তাক্ জানে, গাঁয়ের কেউ কেউ তার কাছে যায়—তেলপড়া, নুনপড়া, লেবুপড়া, আদাপড়া আনতে।

হরেন তার কাছে গিয়ে বলল ছেলেটার কথা, সে সব শুনে বলতে লাগল—ব্যাপারটা

ত' ভাল মনে হচ্ছে না। আচ্ছা এক কাজ কর, আমি আট আঙ্গুল মেপে একটা কাঠি দিয়ে দিচ্ছি, এই কাঠিটা তোমার স্ত্রীর মাথার বালিসের নীচে রেখে দাওগে, পরশু শনিবার সকালবেলা কাঠিটা নিয়ে আমার কাছে আসবে। সেদিন আমি মন্ত্র পড়ে কাঠিটা আবার মেপে দেখব, যদি এটা তখন আট আঙ্গুলের বেশী হয়—তাহলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

হরেন তার কথামত কাঠিটা এনে স্ত্রীর বালিসের নীচে রেখে দিল। তারপর শনিবার সেই কাঠিটা নিয়ে গিয়ে মাধবকে দিয়ে বলল, ছেলেটার চোখ দুটো পর্যন্ত হলদে হয়ে গেছে! কাঠিটা মেপে দেখ রোগটা ধরতে পার কিনা।

হরেনের কথা শুনে মাধব বলল, হ্যাঁ আমি যা' ভেবেছিলাম তাই! মায়ের জন্যই ছেলেটাকে ভুগতে হচ্ছে।

হরেন বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, মায়ের জন্য ছেলে ভুগছে কি রকম?

কি রকম তা' শুনবে, শনি-মঙ্গলবার অন্তঃসত্ত্বা মেয়েছেলেরা চুল ছেড়ে যদি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তাদের পেটের

সন্তানকে রক্তচোষায় ধরে। তোমার ছেলেরও হয়েছে তাই।

মাধবের কথা শুনে হরেনের মাথায় রক্ত উঠে গেলে, মনে মনে সে স্ত্রীর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। তারপর মাধবের কাছ থেকে একটু তেলপড়া নিয়ে বাড়ি এসেই স্ত্রীকে যা' নয় তাই বলতে আরম্ভ করল। স্বামীর গালাগাল সহ্য করা হরেনের স্ত্রীর অভ্যাস আছে, তাই সে মুখ বুঝে সব সহ্য করে নিল। তা না হলে তার কপালে উত্তম-মধ্যম জুটত।

হরেন তেলপড়ার বাটিটা ছেলেটার মাথার কাছে রেখে নিজেই তার গা-হাত-পায়ে মালিশ করতে লেগে গেল। তারপর মাধবের কথামত ছেলের মাথার কাছে একজোড়া ছেঁড়া জুতো, একঘটি জল আর তেল পড়ার বাটিটা রেখে দিল। এতেই নাকি ছেলের রক্তচোষা বন্ধ হয়ে যাবে! বেদান্ততীর্থ মশাই কবিরাজের কাছে হরেনের গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তারপর? তারপর—দিনকয়েক বাদে ছেলেটা মরে গেল।

সেই থেকে ও রোজ সকালে চরণামৃত খায় আর বলে—

"অকাল মৃত্যু হরণম্
সর্ব ব্যাধি বিনাশনম্।"

বেদান্ততীর্থ মশাইয়ের কাছে ঘটনাটা তেমন নতুন কিছুই নয়, কারণ তিনি ছোট-বেলায় গ্রামেই থাকতেন। তখন অনেক ঘটনা যেমন তাঁকে দেখতে হয়েছে, তেমনি কত সংস্কারের ধাক্কা যে তিনি সহ্য করেছেন তার হিসেব নেই।

ছোটবেলার উপাখ্যান ঃ

বেদান্ততীর্থ মশাইয়ের পুরা নাম শ্রীশ্যামা-প্রসাদ ভট্টাচার্য, ডাকনাম—শ্যাম। তাঁর বাবা উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সেটেলমেণ্ট্ অফিসে আমিনের কাজ করতেন। শ্যাম বরাবর বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

উমাপ্রসাদবাবু শেষ জীবনে গ্রামে এসে বাস করতে লাগলেন। শ্যাম তখন বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরের স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়ায় ভাল করে মন দিল।

ছোটবেলায় শ্যাম একটু ডানপিটে ছেলে ছিল, তাহলেও গ্রামের সকলেই তাকে ভালবাসত। তাকে ভালবাসার আর একটা কারণ ছিল। তখনকার দিনে গ্রামের লোক লেখাপড়া বিশেষ জানত না, মেয়েরা বেশীর ভাগই ছিল নিরক্ষর। কাজেই স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আসত শ্যামকে দিয়ে চিঠি লেখাতে এবং চিঠি পড়িয়ে নিতে। কেউ কেউ এসে বলত—ছোট্‌ঠাকুর, পঞ্জিকাটা দেখত, কাল দিনটা কেমন? পশ্চিমে যাত্রা শুভ কি না! অশ্লেষা, মঘা বা দিকশূল হলে ত' আবার যাত্রা করা যাবে না! তীর্থে যাব, দিনক্ষণ দেখে যাওয়াই ভাল।

বৃদ্ধা রমণীরা এসে বলতেন, শ্যাম—নতুন বউকে সাধ দেব, ভাল একটা দিন দেখে দাওনা বাবা। আবার কেউ এসে বলতে আরম্ভ করতেন, বেগুন কুটতে কুটতে মনে হ'ল আজ বোধহয় ত্রয়োদশী। একটু দেখত শ্যাম, কতক্ষণ ত্রয়োদশী থাকবে? সেই বুঝে রান্না করব।

এই রকম পাঁচজনের তাগিদে শ্যাম পঞ্জিকা দেখে শিখল—ত্রয়োদশীতে বেগুন, অষ্টমীতে

নারকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে সিম, চতুর্দশীতে মূলা প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ প্রত্যেক তিথিতেই একটা-না-একটা জিনিস খাওয়া নিষেধ লেখা আছে। এছাড়া সে আরও শিখল—কোন্ তিথি-নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ! খারাপ দিনে যাত্রা করার ফলাফল কি! তখন তার কৌতূহলী মন ভাবত, আচ্ছা অশুভদিনে কি দেশের গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ থাকে? কেউ কি সেদিন ঘর থেকে বের হয় না?

সব চাইতে শ্যামের বিরক্ত লাগত পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলের হরেকরকম চিঠি লিখে দিতে। সেই সমস্ত চিঠি লিখতে বসে মাঝে মাঝে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলত। এই চিঠি লেখার জন্য তার পড়াশুনার খুব ক্ষতিও হত।

পাড়ার সদ্যবিবাহিতা মেয়েরা যখন শ্যামকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে নির্জন জায়গার দিকে যেত, তখনই সে বুঝত এবার তাকে মেয়েটির স্বামীর লেখা চিঠি পড়ে শোনাতে হবে। তারপর গভীর রাত্রে সেই চিঠির জবাব লিখে, পরদিন স্কুলে যাবার সময় ডাকে ফেলে দিয়ে যাওয়ার ঝামেলাটাও তাকেই বহন করতে

হবে ! নচেৎ তারা এসে আবার বিরক্ত করবে। এই ঝঞ্ঝাট তার নিত্যই পোহাতে হত। যার ফলে একদিন সে বিরক্ত হয়ে বলল—চিঠি লিখে দেওয়ার চাইতে আমার পক্ষে তোদের লেখাপড়া শেখান সহজ, তোরা বিকেলের দিকে আসিস, আমি একঘণ্টা করে পড়াব। একটু চেষ্টা করলে অল্প দিনের মধ্যে লিখতে পড়তে শিখে যাবি, আমিও তোদের হাত থেকে রেহাই পাব। সামান্য একখানা চিঠি লেখার কিংবা পড়ার জন্য পরের উপর নির্ভর করা খুব লজ্জার বিষয় ; তাছাড়া একজনের চিঠি আর একজনের পড়া উচিতও নয়।

শ্যামের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে পরদিন থেকে কয়েকজন মেয়ে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করল। আগ্রহ থাকলে কোন কিছুই মানুষের পক্ষে শেখা কঠিন নয়, তার পরিচয় মেয়ে ক'টির কাছ থেকেই পাওয়া গেল।

সেদিন শ্যাম পাড়ার নির্মলাকে চিঠি লেখার কায়দা বোঝাচ্ছে, এমন সমন রাণী হঠাৎ প্রশ্ন করল—আচ্ছা, খারাপ স্বপ্ন দেখলে কি হয় ?

শ্যাম গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, জানি না।

মায়া জিজ্ঞেস করল—কেন, কি হয়েছে ?

রাণী বলে চলল, কদিন ধরেই খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছি। তার উপর আমাদের গরুটার ভাদ্র মাসে বাচ্চা হয়েছে! সবাই বলছে—এতে নাকি সংসারের অমঙ্গল হয়।

শ্যাম কথাগুলো শুনে বলে—এখন বাড়ি যাও, আমার পড়তে বসার সময় হয়ে গেছে। বাবা এসে এই সব আলোচনা করে সময় নষ্ট করতে দেখলে বকাবকি করবেন।

শ্যামের নানা কাজের মধ্যে আর একটি কাজ ছিল বাড়ির হাট-বাজার করা, আর চাল-কুমড়া কেটে দেওয়া, কারণ মেয়েরা চাল-কুমড়া কাটত না। তাদের নাকি চাল-কুমড়া কাটা শাস্ত্রে বারণ আছে। চাল-কুমড়া অর্থাৎ ছাঁচি কুমড়া মেয়েরা যে কেন কাটতে চাইত না, তার রহস্য শ্যাম বুঝত না ; কাজে কাজেই তাকে বাড়ির সব ঘরেরই চাল-কুমড়া কেটে দিতে হত।

একদিন পাশের বাড়ির বিধবা জ্যাঠাইমা শ্যামকে ডেকে বললেন, বাবা, আমার এই চাল-কুমড়াটা একটু কেটে দাও। কাটার লোকের

অভাবে কুমড়াটা খাওয়াই হচ্ছে না। শ্যাম তৎক্ষণাৎ কাটারী দিয়ে এক কোপে কুমড়া কেটে নিজের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তৈরি হল, তারপর জয় মা কালী বলে এককোপে কুমড়াটাকে দু'ভাগ করে দিল।

জ্যাঠাইমা কপাল চাপড়ে বলে উঠলেন, সর্বনাশ করলি ত! জয় মা কালী বলে কোপ্ দিলে বলিদান দেওয়া হয়ে যায়। হতভাগা জানিস না, বিধবারা বলিদানের জিনিস খায় না! এখন এটা দিয়ে আমি কি করব? শ্যাম একেবারে বেয়াকুব বনে গেল। মনে তার ভয়ও হল, কারণ গরীব জ্যাঠাইমার পয়সা দিয়ে কেনা শখের জিনিসটা নষ্ট করে ফেলেছে, একথা তার মা শুনলে ভীষণ বকবেন। তিনি হয়ত বলবেন যা এখন হাট থেকে একটা কুমড়া এনে দিদিকে দিয়ে আয়। শ্যাম যা ভেবেছিল হল ঠিক তাই, তার মায়ের কানে কথাটা যেতেই তিনি বললেন—শ্যাম, তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কি দিন দিন লোপ পাচ্ছে? যা, হাট থেকে ঠিক ওই রকম একটা কুমড়া এনে দে।

শ্যাম অন্যায় করে ফেলেছে, কাজেই তাকে তখন চার মাইল হেটে হাটে যেতে হল।

জ্যাঠাইমা হাটে যাওয়ার কথা শুনে শ্যামকে বলে দিলেন, আমার জন্য পাঁচ পোয়া লবণ নিয়ে আসিস।

চার মাইল দূরের হাট থেকে শ্যাম একটা চাল-কুমড়া আর পাঁচ পোয়া লবণ নিয়ে গলদ-ঘর্ম হয়ে ফিরল। জ্যাঠাইমাকে কুমড়া আর লবণ দিতে গিয়ে তার হল আর এক ফ্যাসাদ।

লবণ দেখে জ্যাঠাইমা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন; শ্যাম ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে গেল। শ্যামের মুখের অবস্থা দেখে জ্যাঠাইমা বললেন, আমারই ভুল হয়েছে বাবা, তোকে যদি বলতাম করকচ্ লবণ আনবি, তাহলে এই ফ্যাসাদ হ'ত না। পাঁচ পোয়া লবণ এখন জলে ফেলা যাবে।

শ্যাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, জলে ফেলে দিতে হবে কেন জ্যাঠাইমা?

বাজারের গুঁড়ো লবণ আমাদের খেতে নেই, খেতে হয় সৈন্ধব লবণ। তার দাম বেশী, তাই আমরা করকচ্ লবণ খাই।

শ্যাম এবার মনে মনে ভাবল—ভালরে ভাল, হাট থেকে বয়ে লবণ এনে দিয়েও ফ্যাসাদ হল মন্দ না। এখন আবার চার মাইল ঠেঙ্গিয়ে

লবণ পালটে এনে দাও। পরের ফাই-ফরমাশ খাটতে গিয়েও বিপদের অন্ত নেই।

এইভাবে নানা সংস্কারের ধাক্কায় শ্যামের কিশোর মন বিষিয়ে উঠতে লাগল; তখন সে ভাবত—পাড়ার বুড়ো-বুড়ীগুলোই হচ্ছে যত রাজ্যের কুসংস্কারের গোড়া।

মনে ভাবলেও শ্যাম কিন্তু সেদিন মুখে কিছু বলতে পারত না, কারণ গুরুজনদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে শুনলে তার বাবা বকে আর আস্ত রাখবেন না। ছোট বেলা থেকে সমাজে নানা রকম সংস্কার এবং অন্যায় অবিচার দেখে, শ্যামের মন একদিন বিদ্রোহ হয়ে উঠল। তখন সে অনাগত দিনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কারণ এত গোঁড়ামি থাকলে কোন জাতির উন্নতি হতে পারে না। এর জন্যই সমাজের বহু লোক বিধর্মী হয়ে গেছে, সমাজের মেরুদণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে—ধর্মান্ধতা। অজ্ঞতার জন্য আমরা দিন দিন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছি, তবু আমরা নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করছি না! সেদিন এ রকম অনেক কথাই শ্যাম চিন্তা করছিল, কিন্তু তার কিশোর মন সেদিন এর কোন জবাব খুঁজে বার করতে পারছিল না।

পাঁচ

তারপর একদিন ঃ

তারপর একদিন নদীর জলে ডুবে গেল গ্রাম, বন্যার স্রোতে মানুষের ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল, ভেসে যে কোথায় গেল তার হদিস নেই। অসহায় নর-নারী শিশু কোলে নিয়ে আর্তনাদ করতে লাগল, কেউ কেউ প্রাণ ভয়ে গাছের উপর বসে বিপদতারণ মধুসূদনকে ডাকতে ডাকতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল।

সাতটা দিন শত শত নরনারীর করুণ আর্তনাদ, নদীর ভীষণ ডাক ছাপিয়ে, আকাশ বাতাস ভেদ করে সারা দেশময় প্রতিধ্বনিত হল, যার ফলে দেখা দিল চারিদিকে হাহাকার! নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য যারা চেষ্টা করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন নদীর অতল তলে তলিয়ে গেছে, কত শিশু তৃণের মতন ভেসে গেছে সর্বনাশা নদীর স্রোতে!

অনাহারে, আতঙ্কে মানুষ যে কত মরেছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। সামান্য যে কয় জন আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তাদের দুর্দশা

চোখে দেখা যায় না। সর্বহারা হয়ে তারা যখন লোকালয়ে আশ্রয়ের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে, তখনও তাদের চোখের জল শুকায়নি। সে করুণ দৃশ্য কল্পনারও অতীত!

দেশের এ হেন দুর্দিনে উমাপ্রসাদ বাবু, তাঁর বড় ছেলে আর ভুবনকে ডেকে বললেন, এখনও তোমরা চুপ করে বসে আছ! শিগ্‌গির গিয়ে নতুন বাড়ির দরজা খুলে দাও। আশ্রয়-হীনদের আগে ওখানে থাকার 'বন্দোবস্ত কর, আমি তাদের জন্য চালে-ডালে মিশিয়ে কয়েক হাঁড়ি খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

উমাপ্রসাদ বাবুর নতুন বড় দালান বাড়িতে প্রায় পঁচিশটা পরিবার, আটচালাতে জন পঞ্চাশেক লোক আশ্রয় পেয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। শ্যামও তার বন্ধু ভুবন তাদের সকলকে খাওয়াবার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল। পাশের বাড়ির মেয়ে সোনা আর রূপা, বন্যা-পীড়িতদের শিশু সন্তানদের খাওয়াবার আয়োজন করার ভার নিল।

তিন-চার কড়াই বালিজ্বাল দিয়ে পরিবেশন করায় বাচ্চাগুলির কান্না থামল, বড়রাও খিদের সময় খিচুড়ি পেয়ে বাঁচল!

এক হাঁড়ি শেষ হয় আবার আর এক হাঁড়ি খিচুড়ি উনোনে চাপিয়ে দেন শ্যামের মা, তাঁকে সাহায্য করতে থাকে দুই বোন সোনা ও রূপা।

আটচালাতে বসে একদল খাচ্ছে এমন সময়ে নতুন বাড়িতে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল, উমাপ্রসাদ বাবু নিজেই সেখানে পরিবেশন করছিলেন। ক্রমশ গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে দেখে শ্যাম আর ভুবন সেদিকে ছুটে গেল, তারা গিয়ে শুনল একদল চেঁচিয়ে বলছে, ওরা ছোট জাত, ওদের সাথে এক সঙ্গে বসে খেলে আমাদের জাত যাবে। আমাদের যদি আলাদা দিতে পারেন তাহলে খাব, নচেৎ খাব না।

কথাটা শুনে শ্যাম অবাক হয়ে গেল, কারণ ওরা সকলেই কয়েক দিনের উপবাসী, মৃত্যুর হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে! আশ্রয়-হীন—তাই উমাপ্রসাদবাবুর দয়ায় আশ্রয় পেয়েছে, পেটে অন্ন নাই, পরনে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, তবু তারা বলে কিনা ছোট জাতের লোকদের সাথে এক ঘরে বসে খেলে জাত যাবে!

শ্যামের বাবা অনেক বুঝিয়ে বললেন—আপনারা এ যাত্রা আগে বাঁচার কথা ভাবুন,

তারপর জাত বিচার করবেন। জাত কাঁচের চুড়ির মতন নয় যে, একটু ধাক্কা লাগলেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া আপনাদের কি মানবতা বোধ বলে কোন জিনিস নেই ? ক্ষুধায় মানুষকে অন্ন, তৃষ্ণায় পানীয় দান—এর চেয়ে বড় ধর্ম মানুষের আর কি আছে ?

উমাপ্রসাদবাবুর এই কথার পর নতুন বাড়ির গোলমাল থামল বটে, কিন্তু জাত পাগল লোকগুলো দুই দলের মাঝখানে একটুক্রো কাঠ রেখে বললেন, "তৃণে কাষ্ঠে দোষং নাস্তি" অর্থাৎ তৃণ কাষ্ঠে ছোঁয়া লাগলে কোন দোষ নেই। লোকগুলোর কথা শুনে শ্যাম দুঃখের হাসি হেসে ভাবল—হায় ভগবান, এদের তুমি মানুষ করেছ কেন !

বন্যার কটা দিন শ্যাম, মানুষের নানারকম অজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হয়ে ভুবনকে বলল—ওরে এদের বল যে, তোমাদের কবি চণ্ডীদাস একদিন বলেছিলেন—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,—
তাহার উপরে নাই।"

ভুবন এ কথার উত্তরে বলে—মানুষকে ঘৃণা করা মহাপাপ, তা যদি এরা বুঝত তাহলে ত কোন দুঃখই ছিল না ভাই।

শ্যাম আর কোন কথা বলতে পারল না, শুধু তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ঘুমিয়ে ছিল গ্রাম ঃ

বন্যার আঘাতে জরাজীর্ণ গ্রামগুলির অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কদিন আগে যেখানে মানুষ বাস করত—এটা যারা না দেখেছে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ল।

নদীর ধারের কিঙ্করপুর গ্রামখানাতে পঞ্চাশটি বাড়ির মধ্যে, মাত্র পাঁচখানা বাড়ি ছাড়া আর কোন বাড়ির চিহ্ন মাত্র ছিল না। বড় বড় আম-কাঠালের গাছ শিকড়সমেত উপড়ে পড়ার ফলে গ্রামের পথঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। তারই জলে তখনও তাঁতিপাড়ার চালের টিন, সূতোসমেত তাঁতের সানা ঝুলছিল। সেগুলো সরিয়ে পথঘাট ঠিকমত পরিষ্কার করা ত দূরের কথা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিজের পৈত্রিক ভিটেতে ফিরে আসার জন্য কেউ

সাহায্য করছে না শুনে শ্যাম ও ভুবন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

কথাটা শেষ পর্যন্ত উমাপ্রসাদবাবুর কানেও গেল, তিনি ভুবনকে বললেন—মানুষের মধ্যে যতই অজ্ঞতা থাকুক না কেন, বিপদের সময় সে কথা ভাবতে নেই। আমি গ্রামের জমিদারদের কাছে গিয়ে এদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি। ইতিমধ্যে তোমরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে, কার কি পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন তার একটা তালিকা করে ফেল। তারপর দেখি কি করতে পারি। উমাপ্রসাদবাবু খুব ভাল লোক, গরীবদের প্রতি তাঁর দয়া আছে, তাই তাঁর প্রস্তাবমত গাঁয়ের জমিদাররা সকলে সাধ্যমত সাহায্য করতে রাজী হলেন।

গোবিন্দপুরের রাইচরণ কিছু চাল-ডাল এবং কয়েকখানা কাপড় সংগ্রহ করে উমাপ্রসাদ-বাবুর নিকট পাঠিয়ে দিল। শ্যাম আর ভুবন সেগুলো দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগল। এদিকে ক'লকাতা থেকেও কিছু সাহায্য এসে পৌঁছল। সেগুলি পেয়ে উমাপ্রসাদবাবু নিজে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বিতরণ করে দিলেন। গ্রামের জমিদার অমৃত চৌধুরী, বন্যাপীড়িতদের

ঘর তৈরি করে দেওয়ার জন্য হাজার টাকা দান করলেন। দেখতে দেখতে উমাপ্রসাদবাবুর ভিক্ষাপাত্র সকলের ক্ষুদ্রদানে পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেককেই একখানি ঘর তৈরি ও মেরামত করার জন্য সম্ভবমত নগদ টাকা দিতে লাগলেন।

মহৎ কাজে অনেক বাধা, তবু শ্যাম আর ভুবন প্রাণ দিয়ে বন্যাত্রাণের কাজ করছিল। পাঁচজনে পাঁচরকম বলা সত্ত্বেও শ্যামেদের পাশের বাড়ির সোনা-রূপা, গ্রামের মহিলাদের মধ্যে কাজ করতে এগিয়ে এল। উমাপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী, তাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে নানারকম সুপরামর্শ দিয়ে দুঃস্থদের ঘর-সংসার গুছিয়ে নেওয়ার কাজে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

বিধাতার লিখন ঃ

শহরের মেয়ে সোনা আর রূপা, গ্রাম্য পরিবেশ রীতিনীতি সবকিছুই তাদের কাছে যেমন নতুন, ঠিক তেমনি তাদেরও আচার আচরণ গাঁয়ের মানুষের চোখে কৌতূহল

জাগায়, বিশেষ করে সোনা-রূপার পায়ে জুতো এবং পরনে রং-বেরংএর শাড়ি দেখে অভিনব বলে মনে হয় গ্রামের বৌ-ঝিদের কাছে ; তাই শ্যামের মায়ের সঙ্গে তারা যখন গ্রাম দেখতে আসে, তখন সকলে কৌতূহলী মন নিয়ে উঁকি মেরে দেখতে থাকে রায় মশায়ের মেয়ে দুটিকে !

সোনা-রূপা, শহরের মেয়ে হলেও গ্রামকে তারা ভালবাসে, পৈত্রিক বাস্তুভিটা ও সেখানকার প্রতিবেশীদের উপর তাদের বেশ মায়া আছে। অল্প ক'দিনের জন্য গ্রামে এসে দুই বোন যে এইভাবে সকলের সঙ্গে মিশে "সমাজ সেবার" কাজ করতে পারবে এটা কেউ আশা করতেই পারেনি !

সেদিন শ্যামের মায়ের সঙ্গে রূপা একলাই গ্রামে গিয়েছিল, বাড়িতে এসে সোনাকে সে বলল—দিদি, শোন একটা মজার কথা ! মাসিমার সঙ্গে আজ নক্‌পুর গ্রামের এক বাড়িতে গিয়ে দেখলাম—উঠোনের মাঝখানে একটা আঁতুড়ঘর, তার মধ্যে আগুন জ্বেলে বসে আছে একটি বৌ। ঘরটার দরজা-জানলা বলতে কিছু নেই, ধোঁয়ার চোটে ভেতরটা

অন্ধকার ! ঘরের বাইরে চালের সঙ্গে ঝুলছে কতগুলো জঙ্গলাগাছ, একটা কচ্ছপের পিঠের খোলা আর একখানা ভাঙ্গা কাস্তে। মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলাম—আঁতুড়ঘরে এসব দিয়েছে কেন ?

তিনি বললেন—গাঁয়ের লোক চিরকাল আঁতুড়ঘরে এই সমস্ত জিনিস দেয়, এতে নাকি সন্তান ভাল থাকে। এগুলো না দিলে সন্তানকে পেঁচোয় ধরে। কেউ কেউ বলে প্রসূতিকে পেত্নীতে পায়। কথাটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তারপর একটা কলম আর তালপাতা দেখিয়ে বললাম—এগুলো কি মাসিমা ?

মাসিমা রূপার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলতে থাকেন—ওটা হচ্ছে বিধাতা পুরুষের কলম। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম —এটা দেয় কেন ? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বল্লেন—লোকে বলে সন্তান ভুমিষ্ঠ হবার পাঁচ দিন পর না্কি বিধাতা পুরুষ এসে সন্তানের ভাগ্যলিপি কপালে লিখে দিয়ে যান। তাই গ্রাম দেশের বুড়ো-বুড়ীরা, আঁতুড়ঘরের সামনে ছয় দিনের দিন কলম আর পাতা রেখে দেন। বিধাতা পুরুষ গভীর রাত্রে এসে সন্তানের ভাগ্য-

ফল লিখে রেখে চলে যান। তাই সকলে এই দিনটিতে নানা রকম স্তব পাঠ করে প্রসূতিকে শোনায়। কেউ কেউ আবার ষষ্ঠ রাত্রি পালন করে, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের পদধূলি এনে সন্তানের মাথায় দেয়, বাড়িতে কথকতা, কীর্তন গানের আয়োজন হয়। এই দিন অনেক রাত পর্যন্ত গৃহস্থরা জেগে থেকে বিধাতাপুরুষ যাতে ভাগ্যফল ভাল লিখে যান, তারজন্য জপ-তপ এবং আরও অনেক কিছু করেন।

মাসিমার কথাগুলো বড় অদ্ভুত লাগে সোনার কাছে, আর তার বাবার কেন যেন হাসি পায়। তিনি বলেন, উমাপ্রসাদের ছেলে শ্যাম যখন জন্মেছিল তখন তার মা এ সব কিছু করতে দেননি, তারজন্যই বোধহয় বিধাতাপুরুষ ওর ভাগ্যফল লেখেননি, কিন্তু··· ।

সোনা হঠাৎ প্রশ্ন করল—তাতে কিন্তুর কি আছে বাবা ?

না না, কিন্তুর কিছু নেই, ভাবছি বিধাতা পুরুষের লিখন ছাড়া ছেলেটা এমনতর হ'ল কি করে ? বাবার মুখে হঠাৎ শ্যামের কথা শুনে, সোনা-রূপা দু'জনেই কি যেন ভাবল মনে।

পরদিন রায় মশায়ের কথা শুনে শ্যামের মা

বললেন—বিধাতা পুরুষ ছেলেটার অদৃষ্টে কি লিখেছে জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, ও কর্মের দ্বারা নিজের অদৃষ্ট তৈরি করে নেবে। কারণ মানুষ কাজ করে—সেই কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের মন বোঝা যায়। যে মানুষ সৎ ও আত্মবিশ্বাসী হয়, সে কোন দিন দুঃখ-কষ্ট পায় না। যাদের আত্মবিশ্বাস নেই—তারা দুর্বল, যারা অসৎ এবং দুর্বল—তারাই জীবনে নানা রকম দুঃখ পায়। শ্যামের আত্মবিশ্বাস আছে, সব সময়ে সৎ কাজ করতে চেষ্টা করে, সুতরাং ওর অদৃষ্ট সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

ছয়

প্রতিবেশীদের ইতিকথা ঃ

ভুবন কবিরাজ সেদিন রোগী দেখতে পাশের গ্রামে গিয়েছিল। রোগীটি তাঁর গ্রামের শিরোমণি মশাইয়ের জামাই, বিয়ের পর থেকেই সে নাকি নানা রোগে ভুগছে। প্রথমটায় পাঁচ জনের কথামত ওষুধ খেয়ে রোগের যন্ত্রণা তার

একটু কমেছিল, কিন্তু কিছুদিন পর অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল। অনেক ওষুধ-পাচন খেয়েও কোন ফল হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত শিরোমণি মশাই, বিশেষ স্বস্তয়ন-হোম-জপ ইত্যাদি করাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতেও কোন ফল হয়নি, দিন দিন রোগীর অবস্থা যেন খারাপ হচ্ছে—সবার মনে হতে লাগল। অগত্যা তখন রোগীর ছোট ভাই ভুবন কবিরাজকে এনে দেখাবার ব্যবস্থা করল।

ভুবন কবিরাজ এসে দেখলেন রোগীর অবস্থা শোচনীয়, হাত-পা ফুলে গেছে, গায়ে রক্ত নাই। তার উপর বাড়ির মেয়েরা রোগীর সর্বাঙ্গে ঠাকুর তলার মাটি আনিয়ে প্রলেপ দিয়েছেন। নানা দেব-দেবীর চরণামৃত খাওয়াচ্ছেন, আশীর্বাদের ফুল বেলপাতা মাথার কাছে রেখে দিয়েছেন। রোগীর মা ও স্ত্রী কান্নাকাটি করছেন আর বলছেন, ঠাকুর ভাল করে দাও, তোমাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা দেব। রোগীর বাবা জ্যোতিষী জানেন, তিনি ছেলের কোষ্ঠী দেখছেন।

তরুণ কবিরাজ ভুবন দাস, খুব যত্নসহকারে রোগী দেখে বললেন, আপনাদের দোষেই রোগ

এতখানি বেড়ে গেছে। সময় মত চিকিৎসা করালে রোগী আরোগ্য লাভ করত। এখন যদি এর চিকিৎসা করাতে চান তাহলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। ওষুধ, পথ্য ছাড়া নিয়ম মত রোগীর সেবা যত্ন করতে পারলে রোগ সেরে যাবে।

রোগীর ভাই কবিরাজের কথা শুনে বলল —আপনি যা বলবেন তাই করতে রাজী আছি, দাদাকে বাঁচিয়ে দিন।

ছেলেটির চোখে জল দেখে ভুবন দাসের বড় মায়া হল, তিনি বুঝলেন ভাই এবং বৌয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট দেওরের চোখে জল নেবে আসছে। লক্ষ্মী শিরোমণি মশাইয়ের মেয়ে, তাঁর স্নেহের পাত্রী। মনটাকে ভুবন কবিরাজ শক্ত করে নিয়ে বললেন, আমি যা বলব তাই করতে পারবে ত?

—হ্যাঁ, পারব।

বেশ, চল আমার সঙ্গে, ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক সময় মত ওষুধ খাওয়াবে। রোগার ঘরের জানলা খুলে দাও। বিছানা এবং গায়ের মাটি পরিষ্কার করে দিতে বল। কেউ যেন ওর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি না করে, কারও

মুখে যেন ও হতাশাজনক কথা শুনতে না পায়। রোগীকে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতে দাও। এর অন্যথা হলে আমি চিকিৎসা করতে পারব না।

রোগীর ভাই তারাপদ খুব ভাল ছেলে। সেই মুহূর্তে সে ভুবন কবিরাজের পরামর্শ মত কাজ করতে মা ও ভাইয়ের বৌকে বলে দিয়ে, কবিরাজ বাড়ি ওষুধ আনতে রওনা হ'ল। পথ চলতে চলতে তারাপদ কবিরাজ মশাইকে জিজ্ঞাসা করল, দাদার অবস্থা কেমন বুঝলেন?

ভাল নয়, বড় দেরীতে আমাকে ডেকেছ, আরও আগে ডাকলে ভাল হত।

আমি বার বার আপনাকে ডাকার কথা বলেছি, দাদার শ্বশুর বাধা দিয়ে এই অবস্থা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বৌদি এবং মায়ের কান্নাকাটি দেখে আপনাকে সংবাদ দিয়েছেন। কথাটা শুনে ভুবনদাস মর্মাহত হয়ে বললেন, এরা নিজেদের ভাল কিসে হবে, তা নিজেরাই বোঝে না! এদের পরামর্শ তোমরা কেন নাও? তারাপদ এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না। চুপ করে ভুবন কবিরাজের সঙ্গে পথ চলতে লাগল।

ভুবন কবিরাজ বাড়িতে এসে তারাপদকে

কয়েকরকম ওষুধ দিয়ে বললেন, কখন কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে তা লিখে দিলাম। সময় মতন এ'গুলো খাওয়াবে। রোগীকে লবণ খেতে দেবে না, জলের পরিবর্তে দুধ খাওয়াতে হবে, ভাল ফল ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ান চলবে না। দুদিনের ওষুধ দিয়েছি, পরশু রোগীর অবস্থা দেখে আবার ওষুধ দেব। কাল বিকেলের দিকে এসে রোগার সংবাদটা আমাকে দিয়ে যেও। তারাপদ চলে যেতেই ভুবনদাস পশ্চিম পাড়ায় রওনা হলেন।

অসময়ে ভুবনকে আসতে দেখে শ্যাম বলল, কিহে! শিরোমণি মশাইয়ের জামাইকে কিরকম দেখে এলে?

বন্ধুর কাছে রোগীর অবস্থা শুনে শ্যাম অবাক হয়ে গেল! উমাপ্রসাদবাবু ঘটনার বিবরণ শুনে বললেন—দেখ ভুবন, ওরা অজ্ঞ। রোগের গুরুত্ব ওরা বোঝে না। তা' যদি বুঝত তা'হলে এ রকম ভুল করবে কেন! শিরোমণি মশাই বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কথায় দুঃখ পাবার কিছু নেই। তুমি চিকিৎসক হয়েছ—তোমার কাজ মানুষের সেবা করা। অজ্ঞতা মানুষের

মধ্যে অনেক দেখতে পাবে—তাই বলে তোমার কর্তব্যে অবহেলা কোনদিন ক'র না।

হরিপদর চিকিৎসায় ভুবনদাস অবহেলা করেনি, নিজের হাতে তৈরি নানারকম মূল্যবান ওষুধ দিয়ে, তাকে আগের চাইতে অনেকটা সুস্থ করে তুলেছে। অবশ্য তারাপদর মত নির্ভীক ভাই বাড়িতে না থাকলে, হরিপদকে ভুবন কবিরাজ বাঁচাতে পারত কিনা সন্দেহ! কারণ শুধু ওষুধ দিয়ে কঠিন রোগ সারান যায় না, ওষুধের সঙ্গে প্রয়োজন মত পথ্য চাই, আর চাই রোগীর মনের মত সেবা। এই তিনটি যাঁরা ঠিকমত করতে পারেন তাঁদের রোগী খুব বেশী কষ্ট পায় না, বরং তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।

সেদিন ভুবন কবিরাজের কাছে ওষুধ নিতে এসে তারাপদ বলল,—দাদা বড় খাই খাই করছেন, মা বলছিলেন পথ্যের সঙ্গে একটুখানি ঝোল দেবেন।

—সর্বনাশ! ও কর্মটি করতে দিও না। যমের সঙ্গে লড়াই করে হরিপদকে বাঁচিয়েছি। এখন যদি অত্যাচার করে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। এখনও প্রায় মাসখানেক ওকে

সাবধানে রাখতে হবে। যদি নেহাত ঐ পথ্য খেতে না চায়, তাহলে সামান্য একটু করে ঘরে তৈরী ছানা দিতে পার। সময় হলেই আমি অন্নপথ্য দেব।

তারাপদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ভুবন কবিরাজ তার কথায় বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেখ বাপু, রোগ একদিনেই জটীল হয়ে পড়ে না, মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ শরীরের উপর নানা অত্যাচার অনিয়ম করে, তার ফলেই দেহের মধ্যে রোগ সঞ্চারিত হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় কেউ চিকিৎসার কথা ভাবে না, শেষটায় যখন অচল হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসা করায়। মানুষের এই অজ্ঞতার জন্য বহু রোগী মারা যায়! তারপর আছে নানা-রকম সংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা। অনেকের বিশ্বাস নেই চিকিৎসার উপর, তারা ভাবে তুক্ তাকেই রোগ সেরে যাবে। অনেকে আবার ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পেতে চায়। তারা একজনকে দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়ে দুদিন যেতে না যেতেই আর একজন চিকিৎ-সকের কাছে দৌড়ে যায়। তার ফলে হয় রোগীর চিকিৎসা-বিভ্রাট! এতেও অনেক সময় বিপদ

ঘটে যায়। যাদের মন দুর্বল তারা রোগীর আবদার মত কুপথ্য দেয়, কুপথ্যের ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতক্ষণ তারাপদ, কবিরাজের কথাগুলো বেশ মনোযোগ সহকারে শুনছিল, বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে—ভুবনদাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালাল।

সত্যিই কঠিন ব্যাধি হয়েছিল হরিপদর। ভুবনদাসের জন্যই এ'যাত্রা তার জীবনটা রক্ষা হল, নইলে লক্ষ্মীর অদৃষ্টে কি ছিল তা' বলা উচিত নয়।

ভট্টাচার্য মশাইয়ের গঙ্গাযাত্রা ঃ

সদানন্দ ভট্টাচার্য শ্যামের জ্যাঠামশাই, তিনি বহুকাল ক'লকাতায় আছেন। তাঁর তিন ছেলে সেখানে চাকরী করে, অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। সেদিন হঠাৎ উমাপ্রসাদ-বাবু ভাইপোদের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন, তারা লিখেছে—"বাবা মৃত্যুশয্যায়, সত্বর আপনারা চলে আসুন।" এই সংবাদ পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সপরিবারে ক'লকাতা রওনা হলেন।

ক'লকাতায় এসে তাঁরা শুনলেন ভট্টাচার্য মশাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী ছেলেরা তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করাতে নিয়ে গেছে। বাড়িতে খুব কান্নাকাটি চলছে। উমাপ্রসাদবাবু শ্যামকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটলেন।

আহিরীটোলা থেকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা কুমোরটুলির বাবুঘাটে এসে পোঁছলেন, পাশেই কাশীমিত্রের ঘাট। সেখানে দুই ভাইপোকে দেখে উমাপ্রসাদবাবু এগিয়ে যেতেই ছোট ছেলেটি তাঁকে দেখামাত্র কাঁদতে লাগল। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা কখন মারা গেলেন ?

ভাইপোর মুখ থেকে কোন জবাব না পেয়ে উমাপ্রসাদবাবু অবাক হয়ে ফের প্রশ্ন করলেন, সন্তু কোথায় ?

শ্যাম গঙ্গার ধারে কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেল—তার জ্যাঠ্‌তুত দাদা সন্তোষ, আর জন-কয়েক লোক জ্যাঠামশাইকে খাটসমেত কোমর জলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কীর্তনীয়ারা পারে বসে খোল-করতাল বাজিয়ে নাম-কীর্তন করছে। উমাপ্রসাদবাবু তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটে গিয়ে বড় ভাইয়ের ডান হাতের নাড়ীটা

দেখতে লাগলেন, অনেকক্ষণ নাড়ী ধরে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি ভাইপোদের ধমক দিয়ে বললেন—সর্বনাশ! তোরা একি করছিস্? দাদাকে এই মাঘ মাসের শীতে কোমর জলে এনে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? শীগ্‌গির উপরে নিয়ে চল।

কাকার ধমক্ শুনে সন্তোষ বাবাকে উপরে তুলে আনল। তারপর ভিজে জামা-কাপড় পরা অবস্থায় শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—এখন কি করতে হবে কাকা?

উমাপ্রসাদবাবু ভাইপোর কথা শুনে ভীষণ চটে গেলেন, রাগে গজগজ করতে করতে বলতে লাগলেন,—তোরা জ্যান্ত মানুষটাকে জোর করে মারতে চাইছিস? এখনও দাদার নাড়ী সতেজ রয়েছে,—কার বুদ্ধিতে তোরা গঙ্গাযাত্রা করাতে এনেছিস্! মাঘ মাসের এই শীতে বুড়ো বাপকে জলে নামাতে তোদের একটুও মায়া হল না কেন— এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কাকার মুখে এই ধরণের কথা শুনে—কেউ আর কথা বলতে সাহস পেল না, সকলেই মাথা হেঁট করে রইল। শ্যাম, জ্যাঠামশাইয়ের কষ্ট

হচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বিছানা আনতে ছুটল।

উমাপ্রসাদবাবু দেখলেন দাদার বেশ জ্ঞান রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তীর্থযাত্রীদের বাড়িতে একখানা ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য সন্তোষ আর পরিতোষকে পাঠালেন, ইতিমধ্যে শ্যামও বিছানা নিয়ে ফিরে এল।

তীর্থযাত্রীদের জন্য গঙ্গার ধারে যে বাড়ি আছে তার একটি ঘরে বৃদ্ধ সদানন্দ ভট্টাচার্য মশাইকে এনে রাখা হ'ল। ছেলেরা সব সময়ে কাছাকাছি থাকে, কারণ কখন কি হয় বলা যায় না।

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে গেল; তবু শ্যামের জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটল না। ছেলেরা প্রমাদ গুণতে লাগল। তারা ভাবল—সর্বনাশ একি হ'ল!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে উমাপ্রসাদবাবু বললেন—দাদার মৃত্যু হতে দেরি আছে, তোরা না বুঝে অযথা এত শীতে ওঁকে কষ্ট দিলি, নিজেরাও কষ্ট পেলি। ছেলেরা নিজেদের অজ্ঞতার কথা চিন্তা করে মনে মনে লজ্জাবোধ করতে লাগল।

ভাইদের কাণ্ড দেখে শ্যাম কিন্তু ভীষণ চটে গিয়েছিল, বাবা সঙ্গে থাকায় সে কিছু বলতে সাহস পেল না। তবে তার বাবাকে শ্যাম একবার বলেছিল—জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু দু'এক দিনের মধ্যেই হবে, তবে বড় কষ্ট পেয়ে মরবেন, এইটাই দুঃখের কথা।

পাঁচদিনের দিন সদানন্দ ভট্টাচার্য মশাই গঙ্গার ধারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ছেলেরা তাঁর শেষকৃত্য সমাপন করে বাড়ি ফিরল। উমাপ্রসাদবাবু ভ্রাতৃশোকের কথা আত্মীয়-স্বজনদের জানিয়ে দিলেন। তারপর অগ্রজের পারলৌকিক কাজ যথাসময়ে করিয়ে তিনি দেশে রওনা হলেন। শ্যাম কয়েক-দিনের জন্য জ্যাঠতুত ভাইদের কাছে রয়ে গেল।

শান্তিলতার আত্মকথা ঃ

শান্তি শ্যামের জ্যাঠতুত বোন, বহুকাল পরে ভাই-বোনে দেখা। কাজের বাড়িতে অনেক ভিড়, তাই কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় নি তারা। সেদিন শান্তিকে সামনে পেয়ে শ্যাম জিজ্ঞাসা করল—কিরে

কেমন আছিস? তোর শ্বশুর-শাশুড়ী কেমন আছেন? কই নগেনকে দেখলাম না ত! সে কেমন আছে?

শ্যামদার অনেকগুলো প্রশ্নে শান্তি বিব্রত হয়ে পড়ল, কারণ সে খুব শান্ত মেয়ে! এতগুলো প্রশ্নের জবাব সে একসঙ্গে দিতে না পেরে বলল—আমরা ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ?

—আছি একরকম, তবে মায়ের শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না—জবাব দিল শ্যাম।

—কেন কাকিমার কি হয়েছে?

—টুক্‌টাক্ অসুখ লেগেই আছে।

—চিকিৎসা করাচ্ছ না?

—হ্যাঁ চিকিৎসা চলছে, ভুবন কবিরাজের ওষুধ খেয়ে একটু ভালও আছেন।

নানাকথা আলোচনার পর শ্যাম বলল—হ্যাঁরে, নগেন এখনও আগের মতন করে?

শ্যাম হঠাৎ ভগ্নিপতির কথা তুলতেই শান্তির মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল, চোখ দুটিও ছলছলিয়ে উঠল। বোনের মনের কথা বুঝতে তখন শ্যামের আর অসুবিধা হ'ল না।

শ্যামদার শেষ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না

শান্তি, তাই সে কাজের অজুহাত দেখিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। শান্তির অনুপস্থিতিতে সন্তোষের স্ত্রী শ্যামকে বললেন,—ঠাকুরঝিকে ত্যাগ করেছে নগেন।

—কেন?

—সে অনেক কথা!

শান্তি মেয়ে হিসাবে খুব ভাল। সংসারের কাজকর্ম করার ব্যাপারে তার যথেষ্ট সুনামও ছিল। তা সত্ত্বেও নগেন তাকে কেন যে ত্যাগ করল এই কথাই শ্যাম বার বার চিন্তা করছিল।

সন্তোষের স্ত্রী বলল, ঠাকুরঝির গায়ের রং কালো বলে তার শ্বশুরবাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করত না। তার উপর বিয়ের পর নগেনের হঠাৎ চাকরীটি চলে যায়। এতে তারা বলাবলি করতে লাগল—ঠাকুরঝির অদৃষ্ট ভাল নয়। বাড়ির সকলের মুখে এই সব কথা শুনে নগেনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল; তারপর থেকেই সে ঠাকুরঝির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। শাশুড়ীও নানাভাবে তাকে লাঞ্ছনা দিতে লাগল। ক্রমশঃ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ঠাকুরঝি; বাধ্য

হয়ে সে একদিন প্রতিবাদ করতেই নগেন ঠাকুরঝিকে খুব মারধর করল, শাশুড়ীও প্রায়ই তাকে মারত।

দিনের পর দিন এত অত্যাচার সহ্য করেও ঠাকুরঝি স্বামীর ঘর করতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে আর সেখানে থাকা সম্ভব হ'ল না, কারণ নগেন আবার বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। সন্তোষের স্ত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, ঠাকুরপো জানত মেয়েরা স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে, তবু সতীনের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না।

শান্তির দুঃখের কথা শুনে শ্যাম মনে বড় ব্যথা পেল, কিন্তু সে এর প্রতিকারের পথ খুঁজে পেল না। অনেকক্ষণ পরে শ্যাম তার জ্যাঠ্‌তুত ভাইয়ের বৌকে বলল—বৌদি,শান্তির মত মেয়েও জীবনে শান্তি পাবে না, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু কি করা যায় বল? আমাদের দেশে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা মেয়ের অভাব নেই, তাদের জীবন-কাহিনী শুনলে চোখ ফেটে জল নেমে আসে। আমি যতদূর জানি সামাজিক অজ্ঞতার জন্যই এই ঘটনাগুলো ঘটছে।

সে যাত্রা ক'লকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে শ্যাম শুধু শান্তির কথাই ভাবছিল, আর নগেনের অমানুষিক ব্যবহারের জন্য মনে মনে তাকে ভৎর্সনা করছিল।

ভুবনদাস শ্যামের কাছে শান্তির কথা শুনে বলল—এদের ভৎর্সনা করে কোন ফল হবে না ভাই! যদি পার এইরকম লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিও, তা না হলে মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

কবিরাজের কথাটি শ্যামের মনে খুব লাগল। সে তখন গ্রামের নব্য-সম্প্রদায়কে ডেকে একটি "পল্লীমঙ্গল সমিতি" গঠন করার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলল—দেখ, তোমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, গ্রাম ও সমাজের মঙ্গল-চিন্তা এখন থেকে তোমাদেরই করতে হবে। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে—কাজেই তোমরা যদি এখন গ্রাম গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ না কর, তাহলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে।

বেদান্ততীর্থের কথায় নব্য-সম্প্রদায় উৎসাহিত হ'ল, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল—পণ্ডিতমশাই, আপনি যদি পেছনে

থাকেন তাহলে আমরা যে কোন কাজ করতে পারি। আপনার মত লোক গ্রামে ছিল বলেই আজ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

সাত

বেদান্ততীর্থের সমাজসেবা ঃ

সেদিন ভুবনদাসের ছেলে বেদান্ততীর্থ মশাইকে প্রণাম করতে এসে বলল, কাল আমার পরীক্ষার খবর এসেছে জ্যাঠামশাই !

—পাশ করেছ নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ—ভালভাবে পাশ করেছ জেনে খুব আনন্দিত হ'লাম। ভুবনকে আমি বলেছিলাম তুমি পাশ করবে, যাক তাকে একবার বিকেলের দিকে আসতে বলবে ; সেকি ভেবেছে আমায় ফাঁকি দেবে ?

কথাটায় খুব লজ্জা পেল জীবনদাস, সত্যিইত এমন সুখবর নিয়ে কেউ খালি হাতে আসে ! তার উপর সারা গ্রামের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম বি-এ পাশ করল। তাছাড়া জীবনকে বরাবর তিনিই লেখাপড়ায় উৎসাহ দিয়েছেন,

শুধু কি তাই! ক'লকাতায় থেকে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা তাকে—বেদান্ততীর্থ মশাই করে দিয়েছিলেন। অনেকবার আর্থিক সাহায্যও করেছেন। সুতরাং তাঁর কাছে জীবনের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

খবরটা পেয়ে বৃদ্ধ ভুবন কবিরাজ স্ত্রীকে ডেকে বললেন—আজকের দুধ দিয়ে ক্ষীর তৈরি কর। বেদান্ততীর্থ নারকেল আর তিলের সন্দেশ ভালবাসে, খুড়িমাকে বল কড়া পাকের কিছু সন্দেশ করতে, বিকেলে মিষ্টি নিয়ে আমার তার কাছে যেতে হবে। তারপর বাড়ির কৃষাণ অধরকে বললেন, ওরে পণ্ডিতের জন্য তোকে যে কাল আমলকী পাড়তে বলেছিলাম ?

—আজ্ঞে এখনই পেড়ে আনছি।

আগে আমলকী আন, তারপর গোটাকতক গন্ধরাজ লেবু নিয়ে আয়, এগুলো এনে একটা ঝুড়িতে গুছিয়ে রাখ—বিকেলে এই সব নিয়ে তুই আমার সঙ্গে পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি যাবি। ফিরতে আমাদের রাত হবে, কাজেই একটা আলোর কথা বাড়িতে বলে রাখিস।

বেদান্ততীর্থ মশাই বিকেলে বাগানের কাজ

দেখতে গিয়েছিলেন, দূরে ভুবন কবিরাজকে আসতে দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, —তুমি কি পাচনের গাছ-গাছড়া খুঁজতে দুদিন ব্যস্ত ছিলে কবিরাজ ?

ভুবনদাস, বেদান্ততীর্থের রসিকতার উত্তরে বললেন—তোমার "পল্লীমঙ্গল সমিতির" সভ্যদের জ্বালায় গাঁয়ে গাছ-গাছড়া আর আছে নাকি ! যা' ছিল সে-সব সাবাড় করে দিয়েছে। এখন ওষুধের জন্য গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে আমাকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে।

—তাইত, ভারী অন্যায় করেছে ছেলেরা ! তুমি তাদের বললেই পারতে, ওরে ঐভাবে গাঁয়ের জঙ্গল সাফ করলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে। গাঁয়ে জঙ্গল না থাকলে রোগ-ব্যাধি আসবে কোথা থেকে ? রোগ আছে বলেই ত তোদের সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা।

বেদান্ততীর্থের ঠাট্টায় ভুবন কবিরাজ লজ্জা পেয়ে বললেন—তা'ত হ'ল, তুমি এখান থেকেই কি আমাকে বিদায় করবে নাকি ?

—আরে রামচন্দ্র ! তোমার জন্য হাট থেকে মিঠে-কড়া তামাক আনিয়ে রেখেছি, বাড়ি চল, এক ছিলিম হবে। কষ্ট করে এসেছ

যখন—তখন তামাকটা না খেয়েই যাবে, তা'কি হয় ?

ভুবন কবিরাজ তামাক-বিলাসী লোক, তামাক খেতে খেতে বেদান্ততীর্থ মশাইকে বললেন—জীবন গিয়ে তোমার কথা বলছিল, তাই এ'বেলা গুরুদক্ষিণাটা নিয়ে এলাম। এখন ঝুড়িটা বাড়ির ভেতরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। অধর, জিনিসগুলো ভেতরে দিয়ে আয়, বলবি কবিরাজ মশাইর বাড়ি থেকে আসছি।

বেদান্ততীর্থ, জীবনের পরীক্ষার সুখবরে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, তোমার ছেলেটি ভালই হয়েছে। এখন ওকে আমার স্কুলেই দাও। গ্রামের ছেলে নিজেদের স্কুলেই শিক্ষকতা করুক। আসছে বার থেকে স্কুলটা হাইস্কুল হয়ে যাবে।

ভুবন দাস বললেন—তুমিই ওকে মানুষ করেছ, তুমি যা বলবে, জীবন তাই করবে। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেও তাই বললে।

জীবনের কথা শুনে পণ্ডিত খুশী হয়ে ভুবনকে বললেন, ওহে কবিরাজ, দেশের হাওয়া বদলে গেছে। আমাদের ছোটবেলায় পিসিমার

মুখে গল্প শুনেছি, সেকালের লোকেরা বলতেন—কিঞ্চিৎ পঠনম্ বিবাহ কারণম্। কারণ মূর্খ ছেলের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। তাই ছেলেরা তালপাতার গোছা নিয়ে গুরুমশাইর পাঠশালায় পড়তে যেত। আর এখন ?—ভুবন কবিরাজ তামাক সেবন করতে করতে জবাব দিলেন—কিঞ্চিৎ পঠনম্ চাকুরী কারণম্, এখন লেখাপড়া না শিখলে ভবিষ্যতে চাকরী মিলবে না !

ভুবন কবিরাজের জবাব শুনে বেদান্ততীর্থ মশাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ ভুবন ! আমাদের ছোটবেলায় সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরকম, সেই সমাজ এখন আর নেই। যত দিন যাবে ততই দেশের অবস্থা বদলে অন্য রকম হবে। দেশে শিক্ষার বিস্তার না হলে আমাদের উন্নতি হবে না। অশিক্ষার জন্যই আমাদের ছোটবেলায় অত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ভেদাভেদ ছিল। ভুবন কবিরাজ বেদান্ততীর্থ মশাইর কথায় বাধা দিয়ে বললেন —ছিল কিহে ! এখনও অনেক গ্রামে নানারকম কুসংস্কার, গোঁড়ামি আছে। থাকাটাই

স্বাভাবিক, কারণ যুগ যুগ ধরে যে জিনিস সমাজের মধ্যে প্রচলিত—তাকে দূর করা খুব সহজ কথা নয়! তাই বলে কি মানুষ চুপ করে বসে থাকবে? গ্রামে এখন আর কেউ চুপ করে বসে নেই,—জবাব দিলেন কবিরাজ মশাই।

সত্যিই আজ আর কেউ গ্রামে চুপ করে বসে নেই। উমাপ্রসাদবাবুর দয়ায় গ্রামের অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি যদি চেষ্টা না করতেন, তাহলে এমন অজগাঁয়ে কোনদিন স্কুল হ'ত না। তাঁর উৎসাহে বেদান্ততীর্থ আর কবিরাজ মশাই, গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়েছেন! তাইত গ্রামের নব্য সম্প্রদায়রা বলে—গাঁয়ের নাম এখন কিঙ্করপুরের জায়গায়—সোনারপুর করতে হবে।

জীবনদাস ব্যঙ্গ করে বলল—গাঁয়ে এখনও শশী কবি বেঁচে আছেন; তিনি বুড়ো হলে কি হবে! কোনদিন শুনবে—তোমাদের নিয়েই কবি, টপ্পাগান রচনায় মন দিয়েছেন।

———